শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর-প্রসঙ্গ

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ

প্রকাশক : শ্রীতারকনাথ মজুমদার
৪৫/ডি/৪ মুর এভিনিউ
টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৪০।

প্রথম প্রকাশ : ১৩৮৪ ফাল্গুন

মুদ্রাকর : স্ট্যাণ্ডার্ড আর্ট প্রিণ্টার্স
১১৫-এ, আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীভগবানের কৃপায় শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর-প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইল। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকরদের অসাধারণ জীবনের আনুপূর্বিক এবং ধারাবাহিক বিবরণ নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ-সমূহে এবং মঠবহির্ভূত অন্যান্য গ্রন্থ হইতে তাঁহাদের জীবনের মূল ঘটনাবলী জানিতে পারা যায় এবং সেই কারণে সেগুলি পাঠ করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু সেই সব গ্রন্থে যাহা আছে তাহাতেই জ্ঞাতব্য বিষয় সব যে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে এমন কথা মনে করিলে ভুল হইবে। উহাদের অতিরিক্ত অনেক ঘটনা আছে যাহা পাঠ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকরদের সহিত আমাদের পরিচয় নিবিড়তর হইবে। সেই সব ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ বা অকিঞ্চিৎকর মনে হইতে পারে, কিন্তু সেগুলি হইতে তাঁহাদের চরিত্রের এমন এমন দিকের সন্ধান আমরা পাইব যাহা হয়ত বহু বড় বড় ঘটনার মধ্যেও পাওয়া যাইবে না। প্রাকৃত দৃষ্টিতে সেগুলি যতই সামান্য মনে হউক শ্রদ্ধাবান পাঠক সেগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে করিয়া পাঠ করিতে আগ্রহান্বিত হইবেন। বিশেষতঃ সাধু-মহাপুরুষদের জীবনী যতই আলোচিত হয় ততই আমাদের মঙ্গল। সুতরাং পুনরাবৃত্তি হইলেও উহা দোষাবহ হইবে না অথবা বাহুল্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

গ্রন্থটি একাধিক বৈশিষ্ট্যের দাবী করিতে পারে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে ইহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে বলিয়া আমরা মনে করি। কারণ, প্রথমতঃ গ্রন্থকার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারায় অনুপ্রাণিত অনুভূতিসম্পন্ন শক্তিমান সাধক। সুতরাং যে দৃষ্টিতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকরদের দেখিয়াছেন তাহা সহজলভ্য নহে।

দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিগত সংস্পর্শে লাভ করিয়া রচিত হওয়ার গ্রন্থটির সর্বত্র অন্তরঙ্গতার ছাপ সুস্পষ্ট এবং সেই কারণেই ইহা এত প্রাণবন্ত এবং হৃদয়গ্রাহী।

তৃতীয়তঃ গ্রন্থকার বেদান্তাদি শাস্ত্রে পরিনিষ্ণাত। শাস্ত্রে অনন্য-সাধারণ অধিকার ও আবাল্য অনুরাগ থাকায় সব কিছুই শাস্ত্রের আলোকে অনুধাবন করার প্রবণতা গ্রন্থটিকে অপর এক বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

গ্রন্থটি যাঁহাদের জন্য রচিত তাঁহারা যদি ইহা পাঠে কিছুমাত্র উপকৃত হন তবে আমাদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

বিভিন্ন ব্যক্তি এই গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যাপারে নানাভাবে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের নিকট আমাদের ঋণ কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্বীকার করিতেছি এবং সকলকেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। মদীয় গুরুভ্রাতা শ্রীমানসপ্রসূন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ইহার পাণ্ডুলিপি এ যাবৎকাল সযত্নে রক্ষিত ছিল; নানা কারণে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। এক্ষণে তাঁহার উদ্যোগে ও সাহচর্যে ইহা সম্ভব হইল। তাঁহার উৎসাহ ও উদ্দীপনা ব্যতীত ইহা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা বাহুল্য বিবেচনা করি। শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু যত্নসহকারে স্বামী কমলেশ্বরানন্দের সংক্ষিপ্ত একটি জীবনী রচনা করিয়া দেওয়ায় গ্রন্থের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই। ইহার জন্য ও অন্যান্য নানাভাবে আমাদের সাহায্য করায় তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। শ্রীলোকেন্দ্রনাথ বসু বহু পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থটি সম্পাদনা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী 'বেদ ও আচার্য স্বামী প্রেমানন্দ' ও স্বামী কমলেশ্বরানন্দের মহাসমাধির সংবাদটি 'উদ্বোধন' হইতে পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দেওয়ায় তাঁহার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানাই। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আকস্মিকভাবে তাঁহার

দেহাবসান ঘটায় তিনি শেষ পর্যন্ত গ্রন্থটি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

দীর্ঘকাল পরে হইলেও স্বামী কমলেশ্বরানন্দের রচনাগুলি যে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতে পারিল ইহার জন্য আমি বিশেষ আনন্দিত এবং সামান্যভাবেও যে স্বামী কমলেশ্বরানন্দের স্মৃতি-তর্পণ করিতে পারিলাম তাহার জন্য নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। ইতি—

শ্রীতারকনাথ মজুমদার

সম্পাদকের নিবেদন

শ্রীমৎ স্বামী কমলেশ্বরানন্দ (ললিত মহারাজ) প্রায় ৪১ বৎসর পূর্বে মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। তিনি ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসঙ্গিনী ও শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে সঙ্ঘজননীরূপে পূজিতা পরমকরুণাময়ী জগন্মাতা শ্রীশ্রীসারদাদেবীর কৃপাপ্রাপ্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্তানগণ ও বেলুড়মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীদের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন এবং দীর্ঘ দিন অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁহাদের পূতসঙ্গলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ সেই সব লোকোত্তর মহাপুরুষগণের স্নেহচ্ছায়াতে তাঁহার অন্তর্নিহিত ধর্মসংস্কার দৃঢ়ীভূত হইয়া তাঁহার বিকাশোন্মুখ সাধক-জীবনের পরিণতি লাভে সহায়তা করিয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি সাধু-মহাপুরুষদের পবিত্র সংস্পর্শে আসিয়া যাহা যাহা শুনিতেন এবং তাঁহার ভাবপ্রবণ চিত্তে যাহা যাহা রেখাপাত করিত, তাহাই কিছু কিছু নিজের দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহার সবটাই প্রকাশ করা উচিত কিনা সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকিতে পারে। কারণ, ধর্মজীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারের রহস্য স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন মানবের কাছে উদ্‌ঘাটিত হওয়া কঠিন। এই কারণেই হয়ত বাউল কবি বলিয়াছেন—

> আপন ভজন কথা না কহিবে যথাতথা,
> আপনাকে হইবে আপনি সাবধান।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ঋষিও বলিয়াছেন—'বেদান্তের পরম পুরুষার্থরূপ অতি গুহ্যতত্ত্ব পূর্ব্বকল্পে উপদিষ্ট হইয়াছিল। যে শান্ত নহে এবং পুত্র বা শিষ্য নহে, তাহাকে উহা প্রদেয় নহে।' কিন্তু অপর পক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে একদা বলিয়াছিলেন, 'রহস্যবিদ্যার দিন চলিয়া গিয়াছে। ভালই হউক, মন্দই হউক, তাহা অন্তর্হিত এবং তাহা প্রত্যাবৃত্ত হইবার নহে। ভবিষ্যতে সত্য

জগৎ সম্মুখে উন্মুক্ত থাকিবে।' স্বামীজীর উক্তির তাৎপর্য এই যে, অধিকারবাদ সত্য হইলেও বর্তমানকালে অধিকারী নির্ণয় করে কে? সুতরাং শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ বিশ্বের দিকে দিকে প্রচারিত হউক তাহার পর যাঁহারা পারেন, সেগুলি গ্রহণ করুন, যাঁহারা পারেন না, সেগুলি বর্জন করুন—ক্ষতি নাই।

সুতরাং এই দুই পক্ষের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আমরা তাঁহার দিনলিপি এবং বিক্ষিপ্ত রচনাবলী হইতে যতদূর সম্ভব শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকরদিগের কথাগুলিই কেবলমাত্র নিষ্কাশিত করিয়া প্রকাশ করিলাম।

ব্যক্তিপূজা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং গ্রন্থটিকে আমরা স্বামী কমলেশ্বরানন্দ-প্রশস্তিতে পরিণত না করিয়া তাঁহাকে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় এক মহান্ সাধকরূপে দেখিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আমরা মনে করি শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকরদিগের জীবনের কোন কোন স্বল্পালোকিত দিকের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে তাঁহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের অধ্যাত্ম জীবন গঠনে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারাই স্বামী কমলেশ্বরানন্দের যথার্থ স্মৃতিরক্ষা। পাঠক লক্ষ্য করিবেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং তাঁহার পরিকরগণই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু যেহেতু এই ধরনের গ্রন্থে একান্ত ব্যক্তিগত কথাগুলি একেবারে বাদ দেওয়া যায় না, সেই কারণে একটি পৃথক্ অধ্যায়ে সেগুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

গ্রন্থের মধ্যে কিছু কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি আছে, ভাষাও সকল স্থলে একরূপ নহে, কোথাও চলিত, কোথাও বা সাধু; কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির কথিত উপদেশ, স্মৃতিকথা ইত্যাদি দিনলিপিতে আছে। সন-তারিখও সর্বত্র পাওয়া যায় নাই; যেখানে পাওয়া গিয়াছে দেওয়া হইয়াছে।

আরও একটি কথা। এই পুস্তকের কোনও অংশ পূর্বে কোথাও

প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য বর্তমানে যে সুবিশাল আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে কাহারও পক্ষে সমগ্র সাহিত্যের গহনে প্রবেশ করা সুকঠিন এবং সেই কারণে গ্রন্থের কোন অংশ পূর্বে প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও তাহার সন্ধান করা দুঃসাধ্য। যদি পূর্বে প্রকাশিত কোন বিষয় বর্তমান গ্রন্থে স্থান পাইয়া থাকে তাহা হইলে আমরা দুঃখিত এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

সম্পাদনা কার্যে শ্রীমানসপ্রসূন চট্টোপাধ্যায় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এই জন্য তাঁহার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে শ্রীতারকনাথ মজুমদার মহাশয় অকুণ্ঠ-ভাবে অর্থ সাহায্য না করিলে গ্রন্থটি আদৌ প্রকাশ করা সম্ভব হইত না।

লোকেন্দ্রনাথ বসু

প্রথম ভাগ

শ্রীশ্রীসারদাদেবী-প্রসঙ্গ

বিদ্যা যস্য পরা শক্তিরবিদ্যা হ্যপরাপি চ।
তামিহোপহ্বয়ে দেবং রামকৃষ্ণং সপার্ষদম্ ॥

পূজ্যপাদ আচার্য বিবেকানন্দের সেই বাণী হৃদয়বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিচ্ছে, 'গাই গীত শুনাতে তোমায়/ভাল মন্দ নাহি গণি/নাহি গণি লোকনিন্দা যশকথা। দাস তোমা দোঁহাকার/সশক্তিক নমি তব পদে।'

শ্রীশ্রীমায়ের এই শুভ জন্মতিথি-বাসরে আমরা আমাদের হৃদয়ভরা শ্রদ্ধাভক্তিপ্রীতি নিয়ে আবেগভরে 'আমাদের মা', 'আমাদের মা' বলে মত্ত হয়ে মায়ের পূজার উপযুক্ত পুষ্পচয়ন করে হৃদয়ডালি ভরে নিয়ে এসে 'জয় মা', 'জয় মা' বলে মায়ের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দেব। মায়ের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দেবার অধিকার তো মা সবাইকেই দিয়েছেন, এতে আর বড়-ছোট ভেদ নেই, ভাল-মন্দ ভেদ নেই, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ নেই, শুচি-অশুচি ভেদ নেই। সবটাই কেবল প্রাণ থেকে হওয়া চাই, এইটুকু দরকার। মা তো আর কিছু দেখেন না, কেবল প্রাণ দেখেন, তিনি প্রাণের কথা বোঝেন, ভাষার প্রয়োজন হয় না, বিদ্যার দরকার হয় না, বুদ্ধির দরকার হয় না, কেবল মমতার দরকার হয়—'আমি আমার' দরকার হয়। 'আমি আমার' ভাব তো ভুলে থাকতে পারি না, নাই বা ভুললুম, তাতে দোষ কি! মায়ের দান—'আমি আমার' ভাব—মাথায় পেতে নেব, মায়ের দেওয়া জিনিস আদর করে বুকে জড়িয়ে রাখব। তবে 'আমি আমার' ভাবটিকে সংসারমুখী না করে ভগবন্মুখী করব। মোড় ফিরিয়ে দেব। বলব—আমরা প্রত্যেকেই বলব অন্তরের অন্তর থেকে—'আমি মায়ের, মা আমার'। মা বড় কৃপা

করে তাঁর সন্তানদের ভিতর 'কাঁচা' 'আমি আমার' ভাব চিরতরে দূর করে 'পাকা' 'আমি আমার' ভাব ঢুকিয়ে দিন—এই প্রার্থনা তাঁর শ্রীচরণে। আমাদের প্রত্যেকেরই প্রাণে ঐ একটি সুরই সদাই বাজুক—'আমি মায়ের, মা আমার !'

মনে পড়ছে একদিন শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনে ঠাকুরঘরের পাশের ঘরটিতে পা ছড়িয়ে বসে আছেন, মালা নিয়ে জপ করছেন, আমি তাঁর শ্রীচরণদর্শনে গেছি। পূজনীয় কপিল মহারাজ পাশে বসে আছেন, আমাদের লক্ষ্য করে মা বললেন (কপিল মহারাজকে সম্বোধন করে), 'বাবা, এই যে এত আসছে দেখছ, আমার তো এসব মনে থাকে না, তাই আমি ঠাকুরের কাছে দিয়ে দিই আর বলি, "প্রভু, তোমার তো সব মনে থাকে, তুমি এদের দেখো"।' এসব কথার অর্থ তখন কিছুই বুঝিনি,—এর গভীরতা কত, এর ব্যাপকতা ও গুরুত্ব কত বুঝিনি ; এর সত্যতা অমোঘ। আহা, মায়ের কৃপায় আমাদের হৃদয়ের মালিন্য যে কিভাবে কেটে যাচ্ছে, ভাইসকল, ভগিনীসকল, সেকথা ভেবে আমরা নিজেরাই অবাক হই। কি ছিলাম আর মায়ের কৃপায় কি হয়েছি এবং আরও কি হব ভাবা যায় না। প্রার্থনা করি, মা আমাদের হৃদয়ের সকল মালিন্য, সকল জ্বালা দূর করে দিয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি দিন, বিশ্বাস দিন, আর এই করুন যেন তাঁর ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। 'শরণাগত, শরণাগত, শরণাগত, মা !'—এই বলে যেন ভাই ভগিনী সকলে মিলে মায়ের চরণপ্রান্তে মিলিত হয়ে পুষ্পাঞ্জলি-সম্ভার তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করি। মা আমাদের পূজা গ্রহণ করুন, পূজা গ্রহণ করে আমাদের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকান। তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমাদের সকল জ্বালা, সকল অশান্তি দূর হয়ে যাক। প্রার্থনা করি, মার সেই সুস্মিতবদন নিরীক্ষণ করে আমরা পরমানন্দে হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়ে মায়ের সন্তান-সন্ততি—যাঁরা দূরে আছেন, যাঁরা নিকটে আছেন, যাঁরা সম্মুখে আছেন, যাঁরা পশ্চাতে আছেন, যাঁরা

ঊর্ধ্বে আছেন, যাঁরা অধে আছেন, যাঁরা দ্যুলোকে আছেন, যাঁরা ভূলোকে আছেন, যাঁরা অন্তরিক্ষলোকে আছেন—সবাই মিলে প্রেমভরে আজ মাকে নিয়ে নৃত্য করি, মাকে নিয়ে নৃত্য করি।

ভাইসকল, মাকে নিয়ে এ দিব্য নৃত্য একদিন দেখার মহাসৌভাগ্য হয়েছিল। মঠের প্রাঙ্গণে একদিন মা এসেছিলেন আর মায়ের ভক্তরা মাকে আরতি করে আনন্দে বিভোর হয়ে নেচেছিলেন। যতদূর স্মরণ হয়, সে সময় বসন্তকাল, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব। শ্রীশ্রীমহারাজ মঠে আছেন। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ, পূজনীয় হরি মহারাজ, পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ, পূজনীয় শুকুল মহারাজ, পূজনীয় অমূল্য মহারাজ, পূজনীয় নীরদ মহারাজ প্রভৃতি অনেকেই মঠে আছেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজের গাড়ি আগে আগে আসছে, শ্রীশ্রীমা যোগীন-মা গোলাপ-মা অন্য এক গাড়িতে পেছনে আসছেন। মঠের তোরণ-দ্বারের নীচে মঙ্গলঘট ফল-পল্লবে সজ্জিত, উপর দিকে পুষ্পমাল্যাদিতে সুশোভিত 'স্বাগতম্ জননি!' লেখা—একখানি লাল শালুর উপর তুলো দিয়ে। তোরণের মস্তকে গাঁদা ফুলের মালা তোরণখানিকে যেন আলো করে রয়েছে। মা-জননী সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আসছেন, তাঁকে সাদরে আহ্বান করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছেন সব মহারাজরা। সেদিনের ঘটনা মনে পড়ছে, তোরণের দ্বার অতিক্রম করে মা-জননীর গাড়ি যেমন মঠের মধ্যে প্রবেশ করল, অমনি যোগীন-ঠাকুরের ছেলেরা শঙ্খধ্বনি করতে করতে মাকে অভ্যর্থনা করতে ছুটে এল। এদিকে কীর্তনের দলও মৃদঙ্গধ্বনি করে অতি মধুরভাবে 'আমরা মা পেয়েছি, মা পেয়েছি, মা পেয়েছি রে' বলে দিগন্তব্যাপী রবে মঠকে কম্পিত করে তুলল। পূজনীয় শরৎ মহারাজ গাড়ি থেকে নামলেন। ধীরে ধীরে গোলাপ-মা এবং যোগীন-মাও শ্রীশ্রীমার গাড়ি থেকে নামলেন! অশোক-তলার কাছে গাড়ি দু'খানি রাখা হল। যেখানে মঠের পুষ্করিণী সেখানে গোয়ালঘরের পাশে মা তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে নামলেন।

ঠিক তারি কিছু পূর্বদিকে এখন শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির। সেই মন্দিরে শ্রীশ্রীমা এখন বিরাজ করছেন। এস ভাইসকল, মায়ের মন্দিরে মাকে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে আমরা মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হই। যতদূর স্মরণ আছে, পূজনীয় হরি মহারাজ, পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ, পূজনীয় শুকুল মহারাজ, পূজনীয় অমূল্য মহারাজ, পূজনীয় নীরদ মহারাজ প্রভৃতি অগ্রবর্তী হয়ে মাকে সঙ্গে নিয়ে ভক্তদের সঙ্গে ধীরে ধীরে মঠের আঙ্গিনায় এসে উপস্থিত হলেন। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমন্দিরে ওঠবার সিঁড়ির কাছে এসে (এখন যেখানে দুর্গোৎসব হয় সেইখানে সিঁড়ির কাছে) মা পূর্বমুখ হয়ে দাঁড়ালেন, আর মায়ের আরতির জন্য পঞ্চপ্রদীপ প্রভৃতি জ্বালা হল। মাকে আরতি করা হবে। পূজনীয় শুকুল মহারাজ সেদিনের পূজায় পূজারী। তিনি ধীরে ধীরে আরতি করতে লাগলেন,—শেষে মাকে চামর ব্যজন করা হল। এত জনসমাগম হয়েছিল যে, আমরা অনেকে পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। বেশ একটু দূরে দাঁড়িয়ে মায়ের এই অপূর্ব পূজা হচ্ছে দেখছি। দূরে থাকলে কি হয়! আনন্দের আর সীমা নেই, চারদিকেই আনন্দ, আনন্দময়ীর আগমনে থৈ থৈ করছে আনন্দ! আনন্দ আর ধরে না। এত আনন্দ যে মুখে বলে বোঝান যায় না। কীর্তন হচ্ছে 'জয় মা' 'জয় মা' রবে, উদ্দাম নৃত্য হচ্ছে 'জয় মা' 'জয় মা' রবে। সে মধুর দৃশ্য স্বপনের মত আমার হৃদয়ে ধীরে ধীরে জাগছে। যেন সব আনন্দের দেশের লোক এক জায়গায় এসে আনন্দ করছেন। সেই আনন্দের স্রোতে, সেই আনন্দের মন্দাকিনীধারায় সকলেই সুস্নাত! পূজনীয় শ্রীশ্রীমহারাজ সেদিন শ্রীশ্রীমায়ের আগমনে কি যে আনন্দে ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন তা পূজনীয় শ্রীশ্রীমহারাজের পরমপারিষদ ভক্তগণ অবগত আছেন। আমরা তখনও মঠে যোগদান করিনি। সুতরাং শ্রীশ্রীমহারাজের সেদিন-কার অপূর্ব দেবভাব দর্শনের তেমন সুযোগ হয়নি। তবে একেবারেই যে দেখিনি তাও নয়। শ্রীশ্রীমহারাজ খোকা মহারাজের ঘরে (তখনকার

দিনে পূজনীয় খোকা মহারাজ এখন পূজনীয় নির্মল মহারাজ যে ঘরে থাকেন সেই ঘরে থাকতেন) খাটখানিতে উপবিষ্ট আছেন, আর পূজনীয় অমূল্য মহারাজ প্রভৃতি তাঁর পরিচর্যায় নিরত। শ্রীশ্রীমা মঠের আঙ্গিনায় যখন প্রথম এসে দাঁড়ালেন তখন শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁকে প্রণাম করেছিলেন। কিরকম ভাবে প্রণাম করেছিলেন, তা আমার দেখার সৌভাগ্য হয় নি। তবে শ্রীশ্রীমাকে যখন অন্য সময়ে তিনি প্রণাম করতেন, তখন সাষ্টাঙ্গ হয়ে ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হতেন—এটা যাঁরা মায়ের উদ্বোধনে থাকাকালে শ্রীশ্রীমহারাজের সঙ্গে মায়ের দর্শনে গেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন। আর আমাদের বন্ধু অশোক মহারাজের মুখে এর অতি সুন্দর বর্ণনা আমি শুনেছি। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ছে, পূজনীয় সুধীর মহারাজের মুখে শুনেছি, পূজনীয় স্বামীজী ও পূজনীয় সুধীর মহারাজ একদিন মা-ঠাকরুনের দর্শনে গেছেন। স্বামীজী মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার পরে যখন সুধীর মহারাজ প্রণাম করতে গেলেন, তিনি সাধারণভাবে প্রণাম করে এলেন। এইটি লক্ষ্য করে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাকে প্রণাম করেছিস?' উত্তরে সুধীর মহারাজ বললেন, 'হ্যাঁ'। কেমনভাবে প্রণাম করেছেন, তা জেনে স্বামীজী বলেছিলেন, 'ওরে মাকে কি অমনভাবে প্রণাম করে?' পরে স্বয়ং মার পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে দেখিয়েছিলেন মাকে কিভাবে প্রণাম করে আত্মসমর্পণ করতে হয়। আমরা অন্ধ, অতি অন্ধ, মা আমাদের চোখের ঠুলি খুলে দিন, মত্ততার নেশা কাটিয়ে দিয়ে তাঁর অভয়পদে স্থান দিন।

এ প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা মনে পড়ছে। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকেও ঐরকম প্রণাম করতে একবার দেখেছিলাম। শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজা হয়ে গেছে। সেবার মা পূজার সময় এসে সোনার বাগানে (যেটি বর্তমানে মঠের মধ্যে এসেছে) ছিলেন। পূজা শেষ হলে অথবা সন্ধি পূজার সময়ে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ মায়ের চরণপ্রান্তে পড়ে ভূমিতে লুটাতে লাগলেন—সেই স্থানে যেখানে মায়ের আরতি করা

হয়েছিল। যার উল্লেখ আগেই করেছি। ঐ স্থানে মায়ের পাদপদ্মে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। শুধু তাই নয়, তারপর আর এক অপূর্ব দৃশ্য দেখেছিলাম—মায়ের পারিষদ যোগীন-মা ও গোলাপ-মাও সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন; ঠিক একই ভাবে মায়ের উভয় সঙ্গিনীর শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছিলেন। এসব দেখে মনে হয় মা যে কি বস্তু তা আমরা কিছুই বুঝি না।

যাক এখন প্রকৃতের অনুসরণ করি। সেদিন শ্রীশ্রীমায়ের আরতি শেষ হয়ে গেলে মঠে একটি আনন্দের হাট বসে গিয়েছিল। মাকে কোথায় নিয়ে বসান হল সেসব দেখিনি, খোঁজও নিইনি। তবে মঠের প্রাঙ্গণে যে ভীম গর্জনে 'জয় মা' 'জয় মা' রবে আশুতোষ ভট্টাচার্য নামক জনৈক ভক্ত উদ্দাম নৃত্য করেছিলেন তা আমি যেন এখনো প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি। তিনিই সেদিন কীর্তনে অগ্রণী ছিলেন, এত মেতে গিয়েছিলেন যে একটু অস্বাভাবিক রকম বোধ হয়েছিল। ওদিকে শ্রীশ্রীমহারাজের ঘরে আর এক অপূর্ব ব্যাপার—শ্রীশ্রীমহারাজ এমন একটা গভীর ভাবে মগ্ন হয়েছিলেন যে তাঁর সেবকেরা একটু ভয়ও পেয়েছিলেন। শেষে শ্রীশ্রীমাকে ঐ ব্যাপারে সংবাদ দিতে হয়েছিল এবং মা স্বয়ং এসে সেদিন তাঁর মনকে উচ্চ ভাবভূমি থেকে ব্যবহারিক ভূমিতে নামিয়ে এনেছিলেন। বুড়ীর কাজ তো চলা চাই! এই ঘটনাটি আমাকে যোগবাশিষ্ঠের একটি দৃশ্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। মহর্ষি বশিষ্ঠের উপদেশে শ্রীরামচন্দ্রের সমাধি দর্শনে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে অনুরোধ করে বলেছিলেন, 'ঠাকুর, অমন করে এখন শ্রীরামচন্দ্রকে সমাধিস্থ রাখলে চলবে না—কাজ যে অনেক বাকী আছে—শীঘ্র নামিয়ে ব্যুত্থিত কর; রাক্ষসবধের জন্য আমি নিয়ে যাব।' বোধ করি আমাদের মলিন অন্তঃকরণরূপ রাক্ষসবধের প্রয়োজনবোধে জগজ্জননী আজ তাঁর গোপালকে উচ্চ, অতি উচ্চ গভীর সমাধিদশা থেকে এই ব্যবহারিক জগতে টেনে নামিয়ে আনলেন। মা-জননী লীলাময়ী, নিত্য লীলা নিয়ে থাকতে ভালবাসেন, তাই সেই লীলার

সাথী হয়ে চলাই তিনি বেশী পছন্দ করেন। লীলা ভেঙ্গে যায় সেটা তাঁর অভিপ্রেত নয়। তাইতো পূজনীয় হরি মহারাজের মুখে পুনঃ পুনঃ শুনেছিলাম—শেষাশেষি এ কথাই বলতেন—ঠাকুরের কাছে নির্বাণ চাওয়াটা অতি সামান্য বলে শুনেছিলেন, 'বুড়ী ছুঁলেই মুক্তি, বুড়ী কিন্তু সেটা চাননা—বুড়ীর ইচ্ছা খেলা চলে।' তাইতো পূজনীয় যোগানন্দস্বামীজী যখন নির্গুণে মন লয় করার জন্য উদ্গ্রীব অথচ শরীর যাচ্চে না তখন মা বলে পাঠিয়েছিলেন, 'যোগীনকে বল ঠাকুরের পাদপদ্ম চিন্তা করে যেন শরীর ছাড়ে।' প্রভুর লীলার সহচর এবার যাঁরা তাঁদের নির্বাণ মুক্তি নেই—সবাইকে আবার প্রভুর সঙ্গে আসতে হবে, যারা এবারও আসেননি তাঁদেরও আসতে হবে।

শ্রীশ্রীমার লীলা দর্শন আমার ভাগ্যে অল্পই ঘটেছে। আমরা মঠের ছেলে মঠেই থাকতুম। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের সঙ্গেই আমাদের ওঠা-বসা খাওয়া-শোয়া। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ হয়েছিল। শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনে থাকতেন, সুতরাং উদ্বোধনে তখন যাঁরা থাকতেন, তাঁরাই মায়ের লীলা দর্শনে ধন্য হয়েছিলেন। তবে কাছে থাকলেই যে দর্শন হবে, দূরে থাকলে হবে না এমন কথাও বলা যায় না। মা যাকে কৃপা করে এক নিমেষের জন্যও স্বরূপটি দেখান, সে-ই ভাগ্যবান, সে-ই মায়ের লীলা বুঝতে সমর্থ।

মাকে আরও কয়েকবার উৎসবাদিতে দর্শন করার সুযোগ হয়েছিল। একবারের কথা মনে পড়ছে, মা তখন উদ্বোধনে। মায়ের দর্শনে যাচ্ছি, সাজিতে অনেক সুন্দর ফুল নিয়েছি। 'যন্ত্রপুষ্প'—অপরাজিতা করবী জবা প্রভৃতিও ছিল। সেগুলি নিয়ে নৌকায় উঠে মঠ থেকে মায়ের বাড়ি যাচ্ছি। যতদূর স্মরণ হচ্ছে মনটা এমন টানছে কতক্ষণে যাব, মায়ের দর্শন পাব আর তাঁর শ্রীচরণে সেইগুলি সমর্পণ করব। খুব একটা যে ভক্তি নিয়ে যাচ্ছি তাও নয়।

কারণ মার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ জীবনে খুব কমই ঘটেছে। তবে মা যে টেনেছিলেন, তা এখন হিসেব করলে বেশ বুঝতে পারি। ছেলে ভুলে থাকলেও জননী তো ভোলেন না! তিনি অভুক্ত তো কাউকে রাখবেন না! সকালে না হয় সাঁঝের বেলা খাওয়াবেনই—মা কি ছেলেকে অভুক্ত রাখতে পারেন! মার প্রাণটা যে কিরকম তা মা না হলে বোঝা যায় না। আমরা সন্ন্যাসী—শিখেছি মায়া আর মায়িক সব সম্বন্ধ ত্যাগ করাই দরকার। সুতরাং মায়ের টান আমরা কেমন করে বুঝব! বন্ধ্যার প্রসববেদনা বোঝার সামর্থ্য যেমন, সন্ন্যাসীদের মায়ের হৃদয়বেদনা বোঝার সামর্থ্যই তেমনই। সুতরাং মা-জননীর হৃদয়-ব্যথা, আমাদের উপর তাঁর প্রাণের টান কত গভীর, ভাষায় তো তা বোঝান যায় না! মায়ের টান, যিনি মা হয়েছেন তিনিই বুঝতে পারেন। তাই দেখেছি যিনি আমাদের মঠের মা ছিলেন (পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ) তিনি যখন তাঁর গর্ভধারিণীর দর্শনে যেতেন, তখন তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতেন, বলতেন, আমাদেব নিকট, 'ওরে আমার যা কিছু বাবা ঐ মায়ের কৃপায়। আমার মা ঠাকুরের নিকট আমায় দিয়েছিলেন, তাই তো আজ প্রভুর আঙ্গিনা পরিষ্কার করে হাত পবিত্র করছি।' বাবুরাম মহারাজের জননীর মত জননী হলে বসুন্ধরা পবিত্রা হন, বংশ পবিত্র হয়, কুলদেবতাগণ প্রসন্ন হন, গ্রাম ধন্য, দেশ ধন্য, ধরিত্রী নন্দিতা হন, দিক্ প্রসন্না হন, দিক্‌পালগণ স্ব স্ব কর্ম প্রসন্নমনে করেন। সুতরাং আদর্শ জননী হওয়া প্রয়োজন।

জগজ্জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবী যিনি আমাদের কল্যাণের জন্য আমাদের মতো সামান্য বেশে না তাও নয়—আমাদের চেয়েও হীনবেশে এই সেদিন আমাদের মধ্যে বাস করেছিলেন—আমাদের সকল সুখদুঃখের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বাতের বেদনা, চলতে পারেন না, তবু ঘর পরিষ্কার করেছেন, পান সেজেছেন, সাধুর সেবা করেছেন, ভাইদের আবদার সহ্য করেছেন, সাধু-সন্ন্যাসীদের আবদার সহ্য করেছেন, মুখে একটা সাড়া নেই, শব্দ নেই,—তাঁকে বোঝা আমাদের

সাধ্যাতীত। এবার মায়ের লীলা অতি দুর্বোধ্য, অতীব দুর্বোধ্য! বড় বড় অসুরপাত করেছেন, কিন্তু মার হাতে খড়্গ নেই, দু-হাতের বেশী হাত নেই। সামান্য লাল নরুনপেড়ে শাড়ী মার পরনে, হাতে সুবর্ণ বলয় মাত্র—তাও ঠাকুরের স্থূলশরীরের অবসানে, ঠাকুর দর্শন দিয়ে মাকে বলেছিলেন, 'ওগো অমন করে হাতের বালা খুলে ফেললে কেন? তোমার কি হয়েছে যে অমন করেছ? আমি এই যে এই রয়েছি, এই তো যেমন এঘর থেকে ওঘরে যাওয়া। এতেই সব ছেড়ে দিলে?'—সেই আদেশেই তো মায়ের হাতে সোনার বালা আবার উঠলো। আমরা বুঝলুম ঠাকুর আছেন, সকলের প্রত্যক্ষ না হলেও মা দেখতে পান, তাই মায়ের আদরের ছেলেরাও তো ঠাকুরকে (মাকে) দেখে থাকেন! তাইতো স্বামীজীর বাণী: 'শ্রীভগবান এখনও রামকৃষ্ণশরীর ত্যাগ করেন নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে এখনও সেই শরীরে দেখিয়া থাকেন ও উপদেশ পাইয়া থাকেন এবং সকলেই ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইতে পারেন।' পূজনীয় শ্রীশ্রীমহারাজের মুখেও ঐকথা শুনেছিলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল ঠাকুরকে দেখতে পাওয়া যায় কিনা—উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'স্বামীজী তো বহুবার দেখেছেন; আমরাও কখন কখন ভাবে দেখি। কখন বা প্রত্যক্ষও দেখি।'—এই বলে মহারাজ বলেছিলেন যখন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশগুলি লেখেন, তখন সেই উপদেশগুলির মধ্যে একটি উপদেশ ঢুকে গিছলো যেটি ঠাকুরের নয়; এবং ঠাকুর হাত নেড়ে তাঁকে কেমন ভাবে বারণ করেছিলেন। পূজনীয় হরি মহারাজের মুখেও শুনেছিলাম। পুরীর শ্রীমন্দিরে হরি মহারাজ প্রবেশ করেছেন ৺শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শনের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে, সহসা দেখলেন ঠাকুর হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছেন। আর বহুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন অপ্রার্থিতভাবে পেয়ে তিনি সহসা যেমনি শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে নিপতিত হলেন—তাঁর শ্রীমুখে শুনেছিলাম অমনি শ্রীশ্রীঠাকুর অদর্শন হয়ে গেলেন। ঘটনাটি আমাদের শ্রীমদ্ভাগবতের নারদের উপাখ্যান

স্মরণ করিয়ে দেয়। নারদ শ্রীভগবানের একবার দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হয়েছিলেন আর সেই সময় দৈবক্রমে ভগবানের শ্রীমূর্তি অন্তর্হিত হলে নারদ যখন পরম ব্যাকুল হয়েছিলেন, তখন আকাশবাণী হয়েছিল : 'হে নারদ, তোমায় এই যে আমার রূপ একবার দেখান হল সেটা কেবল আমার উপর তোমার টান আরও গাঢ় হবে বলে।'

মায়ের লীলা বলতে গেলে ঠাকুরের কথা স্বতঃই এসে পড়ে। তাই এই প্রসঙ্গে আর একটা ঘটনা না বলে থাকতে পারছি না। ঠাকুর যে সেই শরীরে এখনো ভক্তের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তা মঠের শ্রীমন্দিরে একটি ঘটনার উল্লেখ করলে বুঝতে পারবেন। ঢাকায় উৎসবাদি সেরে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ মঠে ফিরে এসেছেন, এসে ঠাকুরঘরে ঢুকেছেন। ঘরে বিশেষ লোকজন নেই, কেবল অশোক মহারাজ আছেন, কিন্তু তিনি অশোক মহারাজকে দেখতে পান নাই বা কিছু। অশোক মহারাজের মুখে শুনেছিলাম —পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরের সঙ্গে কি বলছেন, ঠাকুরের দিক থেকে জবাবটা বোঝা যাচ্ছে না। এসব ঘটনা থেকে মনে হয় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা এখনো আছেন, এখনো ভক্তগণকে তাঁদের সেই নিত্য চিন্ময়ীমূর্তিতে কৃপা করেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজও ঐরকম কথাই বলেছিলেন বলে শুনতে পাই—'শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা তো আছেন। তাঁরাই সকল আপদ-বিপদে, সকল অশুভের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেন।' এসকল কথা স্মরণ হলে মনে হয় আজ আমাদের এই দুর্দিনে আমরা সকলে মিলে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে সমবেত হয়ে 'পরিত্রাহি' 'পরিত্রাহি' বলে ডাকি। মা তো বলেছেন যখনই বিপদ আসবে তাঁকে স্মরণ করলে তিনি বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। তিনি বিপদ-হারিণী তারিণী। এসকল অতি সত্য, অতি সত্য। মা যে প্রাণের ডাক শোনেন সেকথাও শ্রীশ্রীঠাকুর পুনঃ পুনঃ বলে গেছেন। 'ওগো তিনি সব শোনেন। যত ডেকেছ

তিনি সব শুনেছেন। তিনি কানখড়কে।' আমাদের শাস্ত্র তো তাই বলেছেন, 'সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে'—সবদিকেই তাঁর কান আছে। আমাদের প্রাণের ডাকও মা শুনবেন, ঠাকুর শুনবেন। আমরা সকলে সমবেতভাবে প্রাণ থেকে প্রার্থনা করি, মা, আজ এই শুভ সম্মিলনে আমাদের সকল অশুভ কেটে যাক, আমাদের শুভবুদ্ধি হোক, তোমার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি হোক, বিশ্বাস হোক। তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় যেন মুগ্ধ না হই, এই কর মা, এই কর। মা, তুমি সত্যস্বরূপ, সত্যস্বরূপ তোমাতে, হে জননী, আমাদের হৃদয় আশ্রয় লাভ করুক। তুমি আমাদের সত্যকার মা—এ তো পাতানো সম্পর্ক নয় মা। আমাদের কথা রাখতেই হবে, জননী। মা-জননী, রাখতেই হবে আমাদের কথা। ভাইসকল, ভাগিনীসকল আজ এই শুভদিনে মায়ের আশ্বাসবাণী হৃদয়ে ধারণ করে আমরা পরমানন্দে মার প্রসাদ ধারণ করি। মায়েব ছেলে, মায়ের মেয়ে, মায়ের প্রসাদে বলীয়ান হয়ে 'জয় মা' 'জয় মা' বলে আনন্দে বিভোর হই। আমরা আনন্দে গান ধরি ঃ

আমরা মায়ের ছেলে, ডাকি 'জয় মা' বলে।
আমরা মা পেয়েছি, মা পেয়েছি, মা পেয়েছি রে।
এ সংসারে কারে ডরি, রাজা যার মা মহেশ্বরী
আমি আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি।
শ্যামাধন কি সবাই পায়, কালীধন কি সবাই পায়…
ইন্দ্রাদি সম্পদসুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়
সদানন্দসুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়।

মা আমাদের সদানন্দময়ী রাজ-রাজেশ্বরী, মার কৃপাকটাক্ষে ভুক্তি মুক্তি পদতলে। এ হেন রাজরাণী মা আমাদের, যাঁর ইচ্ছামাত্রে জীবের মুক্তি সম্ভব তিনি আজ সামান্য পাড়াগেঁয়ে মেয়ে সেজে আমাদের ছলনা করে, ধরা দেবেন অথচ দেবেন না—এ লীলা বোঝে সাধ্য কার! মার কৃপা না হলে এ লীলা বোঝা যায় না। এবার

সব গোপন লীলা। প্রভু এ লীলায় এমন প্রচ্ছন্নভাবে খেলার সাথীদের নিয়ে খেলা করলেন যে ধরা যায় না, 'ধরি ধরি করি কিন্তু ধরিতে পারি না।' ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি কতক্ষণ নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে, মাঝে মাঝে তো বহ্নির উজ্জ্বল জ্যোতি ফুটে বেরিয়ে আসবেই। সেই মুহূর্তের জন্য ভক্তসমাজ তাঁকে ধরে ফেলত, বুঝে ফেলত। তবে সে যখন তিনি কৃপা করে ধরা দিয়েছেন কেবল তখনি, কেবল তখনি তাঁকে বোঝা যেত, নতুবা কার সাধ্য তাঁকে ধরে?

এ প্রসঙ্গে পূজনীয় হরি মহারাজের সঙ্গে প্রভুর সেই লীলার কথা মনে পড়ছে। প্রভু তাঁকে বলেছিলেন, 'ওহে তুমি নাকি বেদান্ত পড়? তোমার বেদান্তে আছে কী? "ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ মিথ্যা"—এই বইতো নয়? তা বাবু, তিনি না বোঝালে ওসব কি বোঝা যায়? "ওরে কুশীলব করিস কিসের গৌরব, ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে"।' বেদান্তসিদ্ধান্ত স্বয়ং মূর্তি পরিগ্রহ করে দ্বারে এসে দাঁড়িয়ে আছেন—'বেদান্তসিদ্ধান্তো নৃত্যতি সখি, বেদান্তসিদ্ধান্তো নৃত্যতি।' কিন্তু সকল সখি কি আর সে তত্ত্ব বুঝেছিলেন? তিনি সকল খেলায় লুকোচুরি খেলতে যে বড় ভালবাসেন। তাই তো মনে হয় পূজনীয় হরি মহারাজের শ্রীমুখেই শুনেছিলাম—একদিন শ্রীশ্রীপ্রভুর অসুখের সময় পূজনীয় হরি মহারাজ সম্মুখে বসে আছেন। আর সদা চাতুরী-স্বভাব প্রভু গম্ভীরভাবে বলেছেন, 'দেখ গো আমার কত কষ্ট, কত যাতনা।' কিন্তু আবার মনের মধ্যে প্রবেশ করে হরি মহারাজকে বোঝাচ্ছেন, 'কৈ কষ্ট?—কৈ যাতনা?' তাই হরি মহারাজ সহসা বলে ফেললেন, 'কৈ মশাই?—কোথায় আপনার কষ্ট? কোথায় আপনার যন্ত্রণা?' শ্রীশ্রীপ্রভু আরও গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন, 'সে কি গো এত যন্ত্রণা, এত কষ্ট, দেখছ না?' হরি মহারাজের মুখে শুনেছিলাম তিনি আরও জোর বলছেন, 'কৈ মহাশয়? কৈ আপনার যন্ত্রণা? আপনার তো যন্ত্রণা নেই।' প্রভু আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না—সস্মিতভাবে শিষ্যমুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন,

'ঠিক গো, ঠিক বলেছ, আমার আবার যাতনা কৈ!' এ লীলা বোঝা বড় শক্ত। চোর হয়ে চুরি করেন আর গৃহস্থকে বলেন সাবধান হতে। বিচিত্র প্রভুর লীলা। শ্রীশ্রীপ্রভুর সহচরেরাও সব সময় ধরতে পারতেন না। বলিহারি প্রভু ভক্তসঙ্গে তোমার লীলা! ধন্য হে খেলাড়ী! প্রভু এত সাবধানে নিজের কথা গোপন করে বলেছেন কিন্তু যোগৈশ্বর্য তো ঢাকতে পারেননি। মুহুর্মুহুঃ ভাব, মুহুর্মুহুঃ সমাধি, সে সব তো চাপতে পারেননি। সমঝদার লোক তাতেই যে তাঁকে ধরে ফেলত। কিন্তু শ্রীশ্রীপ্রভুর লীলায় প্রধান সঙ্গিনী যিনি—যাঁর সম্বন্ধে প্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে বলেছিলেন,—'ওগো লোকেরা মনে করে এখানেই সব, কিন্তু যিনি আসল তিনি ঐ নহবতে বসে আছেন। তাঁর কৃপা না হলে আমার পরমহংসগিরি ঘুচে যেত।' প্রভুর লীলাসঙ্গিনী আমাদের আদরে সেই মা জননীকে বোঝা আরও দুঃসাধ্য। তাঁর যোগৈশ্বর্যের বাহিরে তো প্রকাশ ছিল না। তাই না তাঁকে দেখতে পাই—কুটনো কুটছেন, পান সাজছেন, ছেলেদের খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন। শুধু কি তাই? ঘরকন্নার সকল কাজে সমান দৃষ্টি। ভাইপো ভাইঝিদের নিয়ে যেন মেতে রয়েছেন। ভাইদের দেখছেন, ভাইপোদের দেখছেন—অতি নিকট আত্মীয়েরা পর্যন্ত বিন্দুমাত্র বুঝতে পারছে না যে কার সঙ্গে তাঁরা রয়েছেন, কার সঙ্গে তাঁরা আবদার, অভিযোগ করছেন, কার পিসি, কার মাসি সেজে তিনি আজ লীলা করছেন। যিনি সমগ্র জগতে চিরকাল ধরে নানা সাজে সেজে নিত্য লীলা করে থাকেন, তিনিই আজ আমাদের নিয়ে লীলা করছেন—এ রহস্য বুঝবে কে? সাত চোঙার বুদ্ধি এক চোঙায় যিনি পোরেন, কমলের কমলে যিনি নৃত্য করে মদমত্ত গজটাকে গিলছেন আর ওগরাচ্ছেন, এই যে সেই কমলে-কামিনী মা আমাদের। হে সাধক, হে ভক্ত, একবার চক্ষু উন্মীলিত করে চেয়ে দেখ। এ আর কেউ নয় সাক্ষাৎ মা-জননী, জগৎ-তারিণী। ভাই-সকল, ভগিনীসকল, এস, আজ সবাই মিলে মা-জননীর পাদপদ্ম

হৃদয়ে-কমলে রেখে প্রেমের কমল দিয়ে পূজা করি। মা আমাদের সেজেগুজে থাকতে বড় ভালবাসেন তাইতো শ্রীশ্রীপ্রভুর মুখের বাণীঃ 'ওরে, ওর নাম সারদা—ও সরস্বতী; তাই সাজতে ভালবাসে।' শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আমাদের মা-জননীকে ভাইসকল, ভগিনীসকল সবাই মিলে আজ মনোমত সাজে সাজাই, এস। মা-জননী আমাদের প্রেমের সাজে সেজে শুভ্রমূর্তিতে, বিমলকান্তিতে আমাদের হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হোন। আমাদের ভাবনা কি! মা বাগ্‌বাদিনী, মার কাছ থেকে একটু জ্ঞানের জ্যোতি, জ্ঞানের শুভ্র জ্যোতি—মায়ের মুখের হাসির মত জ্ঞানের বিমল ভাতি আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হোক। মা যে আমাদের জ্ঞানদাত্রী, শুধু অন্নদাত্রী নন। মার কাছে প্রার্থনা করি যে, মা কৃপা করে তাঁর আশ্রিত ও আশ্রিতা সকলকেই পরিতৃপ্ত করুন—পেটের খিদেও মেটান আর হৃদয়ের খিদেও দূর করুন। 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং'—জগৎ তাঁর পূর্ণ সত্তায় পূর্ণ জ্ঞানে ও পূর্ণ আনন্দে আজ উদ্ভাসিত হোক। আমরা তো আর কাউকে মা বলতে পারব না। 'তেমন ছেলে নই মা আমি, মা, ডাকিব যাকে তাকে। আর কাকে ডাকব শ্যামা, ছাওয়াল শুধুই মাকে ডাকে' —এই বলে আজ আদর কাড়িয়ে মাকে জোর করে ডাকি। দেখি তিনি কেমন তাঁর সন্তানকে চুষি দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে পারেন। কৃপাময়ী মা-জননী, সংসারের ঐশ্বর্য চুষি দিয়ে আর ভুলোলে তো চলবেনা মা! 'আর ভুলালে ভুলবো না মা হেরেছি তোর রাঙ্গা চরণ!' মা-জননী, এই স্থূল মূর্তি পরিগ্রহ করে আমাদের কাছে এসে তোমার শ্রীচরণ দর্শন ও স্পর্শনের যে অধিকার দিয়েছ মা—সে কথা কি গল্প কথা হবে?—সে ত গল্প নয়, সে ত উপকথা নয়। সত্যই যে মা তুমি এসেছিলে—জগতের মা বলে বেদ-পুরাণ-তন্ত্রে যাকে বলে। তুমি যে মা গায়ত্রী, স্বয়ং সরস্বতী, স্বয়ং ভারতী। এই ভারতী কি ভারত বুঝবে না! তবে এত কষ্ট করে কেন এলে মা! বড় ঘরের আদরের মেয়ে তুমি, এত কষ্ট করে কেন এলে মা! মাগো, মা-জননী, যদি

কৃপা করে এলে গো জননী, তবে কৃপা করে তোমার স্বরূপ প্রকাশ কর মা, স্বরূপ প্রকাশ কর। তোমার জ্ঞানের প্রদীপটা একবার তোমার শ্রীমুখে ধর মা—আমরা তোমায় চিনি, তোমায় জানি—জেনে ধন্য হই। ধরা তো দেবে না, তাই কতরকম করে নিজেকে ঢেকে রেখেছিলে মা। লোকে যাদের শিষ্য বলত স্বয়ং শ্রীহস্তে তাহাদেরই উচ্ছিষ্টস্থান পরিষ্কার করে জগৎকে দেখালে এরা শিষ্য নয়, তোমার সন্তান মা, সত্যই সন্তান—পাতান সম্পর্ক নয়। যুগে যুগে বেদবেদান্ত বলে আসছেন গুরুর সেবার সম্ভার নিয়ে গুরুর শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হতে হবে। এবার বেদবেদান্তকে হার মানালে মা, হার মানালে। গুরু হয়ে গুরুত্বের বোধ নেই—মা তো মাই বটে। এ সব লীলা তোমাতেই সম্ভব মা-জননী। তোমার দর্শনে গিয়ে কত ভক্ত স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁদের প্রাতরাশের বন্দোবস্ত করার জন্য স্বয়ং দুধ নিয়ে এসে পেয়ভোজ্য প্রস্তুত করে দিয়েছ মা। অন্ধ আমরা অতি অন্ধ, মা তোমায় চিনিনি, চিনিনি। তোমার কৃপা বিনা চিনব কিনা তাও বলা যায় না। তাই তো ধন্য কলিযুগ। এটা সত্যযুগ বলে শুনেছিলাম পরম ভাগবত বাবুরাম মহারাজের শ্রীমুখে, 'প্রভু যখন এসেছেন, ওরে এখন কি আর কলি আছে? সত্যযুগ পড়েছে।' কিন্তু এ সত্যযুগ যে মা আগের সত্যযুগের মতো নয় দেখছি—সে সত্যযুগে তো বেদের ধর্ম ছিল প্রবল। তখন ছিল, শিষ্য হবেন 'সমিৎপাণিঃ', যাবেন গুরুর কাছে. আর গুরু হবেন দণ্ডপাণি। গুরুর শাসনে প্রশাসনে চলে জীবন কাটিয়ে জীবন গোড়ে তোলবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এবারকার এ সত্যযুগে হল সবই উল্‌টো। শিষ্য হলেন দণ্ডপাণি আর গুরু হলেন অন্নপাণি। অন্নপূর্ণা মা, আমাদের জন্য পরমান্ন প্রস্তুত করে দেবার জন্যে ব্যস্ত আর আমরা ঔদ্ধত্যের দণ্ড হস্তে, 'এখন নয় মা এখন নয়' বলে মুখ ঘুরিয়ে চলেছি। বলিহারি প্রভুর লীলা, বলিহারি প্রভুর লীলায় সঙ্গিনীর লীলা! এ যে প্রভুর বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল দেখছি: 'এখনকার ব্যাপার বেদবেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে।' সত্যই বেদ হার মেনেছে। বেদের বেদে আর

থই পাচ্ছে না। কত ভক্তের মুখেই শুনেছি মা স্বয়ং উপযাচক হয়ে বলছেন, 'ওগো মন্‌তোর নেবে?' ভক্ত বলছেন, 'আজ্ঞা, এখন তো প্রস্তুত নই।' তাঁদের মুখেই শুনেছি হয়ত আরও অনেকদিন পরে তাঁরা মার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেছেন। যাঁর দর্শন পাওয়া ভার, দেবতারা যাঁর দর্শনের জন্য লালায়িত—সন্ত্রস্তে যাঁর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে বলছেন—আমরা আহাম্মুখ, আমরা হট্ হট্ করে তাঁর সন্নিধানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। তা তাঁর সুখ-অসুখ কিছুই দেখিনি। বলিহারি আমাদের বুদ্ধি!

সে একবার মনে পড়ছে এক পার্শী ভক্ত আমার সঙ্গে মার শ্রীচরণ দর্শনে গিয়েছেন। মা তাঁর ভাষাও বোঝেন না। মধ্যস্থ ব্যক্তি কথা কয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। মার আর সবুর সইল না, তাঁকে হিন্দীতে বলতে বললেন। আর তখনি প্রভুর পাদপদ্মে অর্পণ করতে উদ্যত হলেন। তখন মার বড় অসুখ। তাই তাঁর সেবক যিনি মধ্যস্থ ছিলেন তিনি বলে ফেললেন, 'মা আপনার শরীর খারাপ, দাঁড়ান একবার পূজনীয় শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করে আসি।' পূজনীয় শরৎ মহারাজ হেসে বললেন, 'মার যদি ইচ্ছা হয় তবে দেবেন, আমি আর কি বলব!' সেবক এসে দেখলেন ইতিমধ্যে মা প্রস্তুত হয়ে ধ্যানস্থ, তাঁকে কৃপা করবেনই করবেন। খানিক পরে দেখলুম সেই ভক্ত মার প্রসাদ—অন্তঃপ্রসাদ ও বাহ্য-প্রসাদ এক ঠোঙা (ঠোঙা ভরা প্রসাদ)—নিয়ে নেমে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে হাসলেন। এসব লীলা বোঝা যায় না। মার কৃপা ছাড়া বোঝা যায় না। মার তো কৃপার বাতাস বইছে—কেবল একটু প্রার্থনা করে জানাতে হবে, মা, তোমার কৃপা যেন জীবনে উপলব্ধি করি।

মা দক্ষিণ দেশে গেছেন। সে দিকের দিক্‌পাল পূজনীয় শশী মহারাজ মাকে পেয়ে কি করবেন তা ঠিক করতে পারছেন না। হাজারে হাজারে ভক্ত সমাগম হচ্ছে। মা তাদের ভাষাও বোঝেন না। কিন্তু তা হলে কি হবে? এ আর এক দেশ। এ দেশের ভাষা যে

অন্য, সে ভাষা তো মা বোঝেন। হৃদয়ের ভাষা তো মা বোঝেন। যে ছেলেটা মুখ ফুটে বলতেও পারে না 'মা খিদে', মা কি তার খিদে কম বোঝেন? এ যে সত্যিকার মা। মা সেই সব নীরব ছেলেদের নীরব হৃদয়ের আর্তি বুঝে কত কৃপাই না করেছেন। তা করবেনই তো! কৃপা করতেই তো তিনি এসেছিলেন। দুরন্ত ছেলেরা অনেকদিন ধরে খেলায় মেতে আছে। বুড়ী তো স্থির থাকতে পারলেন না। খেলা চালানই বুড়ীর ইচ্ছে বটে কিন্তু এবার খেলে খেলে বুড়ীও এলে গেছেন। ছেলেরা বড় সংসার-খেলায় মেতেছে—ঘরে আর ফিরতে চায় না। তাই দেখে বুড়ী এবাব ঘরের ছেলেদের ঘরে নিতে এসেছেন। মা-জননী, ডাক মা একবার। তোমার মধুর ডাক শুনে তোমার দুরন্ত ছেলেরা কেমন খেলায় মেতে থাকে দেখি দিকি একবার! ডাক মা, ডাক একবার, তোমার মধুব আহ্বান শুনে আর যে থাকতে পারি না। যাই মা যাই, তোমাব সাড়া পেয়েছি মা, এবার তোমার ছেলে তোমার কোলে যাই মা! আমাদের গায়ে অনেক ধূলা, অনেক মাটি লেগেছে মা-জননী। এ ধূলা ঝেড়ে তোমায় কোলে নিতে হবে মা। ধূলার বহর দেখে তুমি কি আমাদের পায়ে ঠেলবে মা? তা তো মনে হয় না জননী। তোমার সেই সকরুণ মূর্তি মনে হলে এ কথা তো কল্পনায় আসে না। তখনও তো কত অপরাধ করেছি -কোন অপরাধ তো নাওনি মা! তুমি না শ্রীমুখে বলেছিলে: 'বাবা, আমি দোষ তো কারু দেখি না।' অদোষ-দর্শী মা আমাদের—দোষ তো তিনি দেখেন না—তোমার চোখ তো তেমনধারা নয় মা। তুমি যে নির্দোষ মা-জননী—তুমি যে দোষ দেখ না মা, সেটা আর একটা বেশী কি! তুমি দোষ দেখলে আমরা কোথায় দাঁড়াই মা? আমাদের তো দাঁড়াবার স্থান নেই। অনেক কাল কেটে গেছে, মা ছাড়া মায়ের ছেলে আর কতদিন থাকতে পারে! এবার ধূলা-খেলা ছেড়ে তোমার ঘরের ছেলে আমরা ঘরে যাই জননী—এই কর মা, এই কর। মা, জগতে এসে এক• নূতন আলো

দিলে মা—গুরুশিষ্য সম্বন্ধ উঠিয়ে দিলে, মা আর তাঁর ছেলে এই এক নূতন অতি নূতন সম্পর্ক দেখালে মা। গুরুশিষ্যভাব হলে পাছে অভিমান এসে জোটে তাই কি সে ভাব উঠিয়ে দিলে জননী? অথবা শেষ পর্যন্ত সে ভাব টিকবে না সেই জন্যই এই নূতন সম্বন্ধ পাতালে মা? ঠাকুরের কথা: 'গুরু যেন সখি—তিনি শেষ পর্যন্ত থাকেন না—গুরু ইষ্টে লয় হয়ে যান, গুরু বলেন, "ঐ তোর ইষ্ট"।' 'সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই।' পাছে শেষ পর্যন্ত তিনি স্বয়ং সেই শ্রীমূর্তিতে না থেকে ইষ্টে লয় পেলে তাঁর অবোধ সন্তান-সন্ততি ভয় পাবে এ জন্যই কি মা গুরুশিষ্য সম্বন্ধের বদলে মা ও ছেলে সম্বন্ধে প্রকট হলে—কেননা শেষ পর্যন্ত সেই সম্পর্ক থাকবেই, থাকবে। সম্বন্ধের রাজত্ব যতক্ষণ ততক্ষণ তো আর ইষ্টকে বাদ দেওয়া যাবে না —উপাস্যকে বাদ দেওয়া যাবে না। তবে সে রাজ্য যখন ছেড়ে যাবে উপাস্য-উপাসক ভাবই যখন উঠে যাবে তখন তো বলা-বলির পার, তার জন্যে আর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। এবারকার লীলায় সেই তত্ত্বের প্রয়োজনও নেই। সব একেবারে ব্রহ্মে লীন হবার কথায় প্রভুর বাণীটি স্মরণ করা আবশ্যক। পূজনীয় হরি মহারাজকেই তো প্রভু বলেছিলেন যখন পূজনীয় হরি মহারাজ ব্রহ্মনির্বাণ প্রার্থনা করেছিলেন: 'ও কি গো, লয় হওয়া আবার কি? ব্রহ্মজ্ঞান থু থু থু। ও তো ঘষটে ঘষটে চিকে ওঠা। ওতো ভাল খেলুয়াড়ির কথা নয়। যারা তেমন তেমন খেলোয়াড় তারা পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে খেলা করে—কারণ তাহলে খেলা অনেকক্ষণ চলবে। লয় হওয়া এ ঘরের কথা নয়। মার ইচ্ছে খেলা চলে।' এখানে দেখা যাচ্ছে যতদিন মার খেলা চলবে, ততদিন তো মা থাকবেন। সুতরাং গুরুশিষ্যভাব উঠিয়ে দিয়ে মা এবার সাক্ষাৎ মার স্থান অধিকার করবেন—তাই গোড়া থেকে নিজের আসন ঠিক করে মা-জননী মার যোগ্য আসনে, সন্তানের হৃদয়াসনে বসলেন। একথা কি তখন বুঝেছিলাম! যেদিন কৃপা করলেন, সবই বললেন মনে

হল, নিজের সম্বন্ধে তো কিছুই বললেন না। তখন কিছু বুঝলুম না। পরে যখন একদিন শ্রীচরণে নিবেদন করে জানালুম—মা গুরুও বুঝলুম ইষ্টও শুনলুম। 'মা, আপনাকে কি বলে ভাবব?' মার মুখে সে কথার জবাব নেই—নীরব, শেষ বললেন, 'বাবা, ঠাকুরকে ভাবলেই হবে। আমার আর কি।' কিন্তু নীরব ভাষায় তিনি যে জবাব দিয়েছিলেন, তাঁর দাস, চিরদাস—ইহ জনমে দাস, পর জনমে দাস, জনমে জনমে দাস— এবার মার কৃপায়, সে রহস্য বুঝেছে। মা যে ইষ্ট, প্রিয়, অতি প্রিয়। প্রিয় ব্যক্তি কি আর প্রিয় ব্যক্তির নিকট 'আমি অমুক' 'আমি তমুক' ইত্যাদি বলে পরিচয় দেয়। যিনি ভাগ্যবান, যাঁর প্রিয়ের সঙ্গে জীবনে মিলন হয়েছে তিনি প্রাণে প্রাণে এ রহস্য বুঝবেন, রস পাবেন, রস পেয়ে ডুবে যাবেন। আমরা মায়ের শ্রীমূর্তি হৃদয় কমলাসনে বসিয়ে আজ এখানে বিদায় নিই। বিদায় নিতে মন সরে না। এ তো বিদায়ের দিন নয়—এ যে মার কাছে আমাদের মিলনের দিন। না বিদায় চাই না মা, বিদায় নয়। বলি, আসি মা আসি, তোমার কাজে আসি মা আসি, জীবন তরী নিয়ে তোমার কর্মের স্রোতে এবার ভাসি মা ভাসি। সে তরীর দাঁড়ি মাঝি মা তুমি, আর তোমার যারা সাথী। প্রসাদী ভাষায় বলতে হয়—

প্রসাদ বলে ভব সমুদ্রে বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা।
(এবার) জোয়ার এলে উজিয়ে যাব, ভাটিয়ে যাব
ভাটার বেলা।
মায়ের ভরা প্রেমের ভরা গাঙ্গে বান ডেকেছে ভাই।
কে আছ দাঁড়ি মাঝি পাল তুলে দে ভেসে যাই
জীবনতরী নিয়ে ভেসে যাই, ভাসিয়ে নে যাই
ভেসে যাই, ভাসিয়ে নে যাই।
(মায়ের কৃপার স্রোতে পাল তুলে দিয়ে)
(ভাসে তরী কৃপার বাতাসে)
ভেসে যায় ভাসিয়ে নে যায় আকাশে

ঐ চিদাকাশে

বাতাসে ওগো কৃপা বাতাসে।

বন্ধুগণ, ভাইসকল, ভাগিনীগণ আজ মার কৃপা-বাতাসে আমাদেরও ছোট বড় নিজ নিজ তরীগুলি ভাসিয়ে সেই অনন্তের দিকে অগ্রসর হই, চিরতরে অগ্রসর হই! ওঁ হ্রীঁ ওঁ॥

মায়ের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীসারদায়ৈ সনাথায়ৈ সভক্তপারিষদায়ৈ

নমো নমঃ।

এষঃ সভক্তিপুষ্পাঞ্জলিঃ

শ্রীশ্রীদেব্যৈ নমঃ

প্রসীদ দেবি কল্যাণি জগতামম্বিকে শুভে।

আর্তিহন্ত্রী সুতানাং ত্বং প্রসীদ পরমেশ্বরি॥ *

---

* শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ভবানীপুরে গদাধর আশ্রমে ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ভক্তসম্মেলনে পঠিত।

ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গ

১

ভাবরাজ্যের রাজা শ্রীশ্রীপ্রভুর বড় আদরের সন্তান শ্রীশ্রীমহারাজের শুভ জন্মদিনে আজ আমরা তাঁর সেই বাণী যেন শুনতে পাচ্ছি, তাঁর সেই প্রাণের ভালবাসামাখা বাণী, সেই আদরভরে তিনি আমাদের ডাকছেন, 'আমার মঠের বাবারা কোথায়?' সে বাণীর আহ্বানে প্রাণ যে মেতে উঠেছে—সে মধুর বাণী প্রাণে যেন অমৃতের প্রবাহ ছুটাচ্ছে—আহা তেমন মিষ্ট স্বর তো শুনিনি! যেন মধু ক্ষরণ হচ্ছে। সেই ধন্য যিনি শ্রীশ্রীমহারাজের সেই মধুর বাণী, মধুর আহ্বান শুনেছেন। সেই প্রাণঢালা ভালবাসা যা অতি গোপনে, অতি সযতনে তিনি প্রাণের মধ্যে চেপে রেখেছিলেন। আমাদের জন্য যিনি সদাই শুভ চিন্তা করতেন অথচ মুখ ফুটে বলতেন না, এমন গোপন মানুষ তো আর দেখিনি! শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে যে 'বর্ণচোরা' আম বলতেন তা কি অক্ষরে অক্ষরে সত্য! তিনি বর্ণচোরাই বটে! চোরার সাথী তিনি—যিনি ব্রজবাসীর মনচোরা, ক্ষীরচোরা, ননীচোরা সেই জীবের প্রাণচোরার সাথী তিনি। তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখবেন এতে আর আশ্চর্য কি! প্রাণ চুরি করে, প্রাণের মধ্যে বাস করেও ধরা দেবেন না এতে আর আশ্চর্য কি! লুকোচুরি খেলতে তিনি যে বড় মজবুত! পাছে ধরা পড়ে তাই তাঁর ভাব কত চেপে চেপে রাখতেন—কত ঠাট্টা, কত আমোদ নিয়ে থাকতেন! বাহিরে থেকে কি কিছু বোঝা যেত তাঁকে? তবুও সেই স্বর্গীয় জ্যোতি, সেকি ঢাকা যায়?—মেঘের পাশ দিয়ে যেমন সূর্যের কিরণ-ছটা বেরিয়ে পড়ে, চাঁদিনী রাতে চাঁদের ছটা যেমন মেঘের পাশে শোভা বিস্তার করে, সেইরকম শ্রীশ্রীমহারাজের অন্তর্নিহিত বিমল কিরণ আপনি ফুটে বেরোত। যাঁরা তাঁর সঙ্গ ক্ষণেকের জন্যও

করেছেন সেইসব ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই তাঁর অন্তর্নিহিত অমৃতের আস্বাদ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছেন—সেকথা আর বলে বোঝানর বিষয় নয়। সে সব ধ্যানের বিষয়—তিনি ধ্যানমঙ্গল পুরুষ ছিলেন। তাঁর লীলা ধ্যান করলে আমাদের মঙ্গল। এতবড় মঠ-মিশনের একচ্ছত্র সম্রাট কিন্তু তিনি কিনা সামান্য ফষ্টিনষ্টি, আমোদ প্রমোদ নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন—এ রহস্য, এ তত্ত্ব কে বুঝবে? বোঝা তো যায় না! বোঝাবুঝির পারের মানুষের তত্ত্ব বুঝতে যাওয়াই বাতুলতা। কেবল ধ্যানের বিষয় তিনি। তাঁকে ধ্যান করলে আমাদের কল্যাণ, পরম কল্যাণ,—ঐহিক কল্যাণ, পারত্রিক কল্যাণ। তাইতো গুরুমূর্তি ধ্যানের এত মহিমা শাস্ত্রে বলেছেন। গুরুর বাণীই বেদ, গুরুর বাণীই মন্ত্র, গুরুর কৃপাই মোক্ষের অমোঘ উপায়। একবার ধ্যান করলে, একবার স্মরণ করলে হৃদয় পবিত্র হয়ে যায়। পুণ্ডরীকাক্ষ আর কারা। যাঁরা প্রভুর আপনজন, তাঁরাই তো পুণ্ডরীকাক্ষ! তাঁদের স্মরণে তো ভিতর বার সব পবিত্র হয়ে যায়। শ্রীশ্রীমহারাজ কি শুধু ঠাকুরের আপনজন—না আপন হতেও আপন—তাঁর স্বরূপভূত। আমরা কি তা বুঝি? যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা বুঝেছিলেন। বুঝেছিলেন স্বামীজী মহারাজ, বুঝেছিলেন বলেই তো বলতেন, 'ও আমাদের রাজা মহারাজ।' তাইতো যত আবদার তাঁর মহারাজের উপর ছিল - সবচেয়ে বেশী আবদার। পূজ্যপাদ স্বামীজী তাইতো বলতেন, 'যদি সবাই আমায় ছাড়ে, রাজা আমায় স্থান দেবে।' যত জোর কি মহারাজের ওপর ছিল তাঁর! পত্রে লিখতেন: 'অভিন্নহৃদয়েষু।' বুঝতেন পূজনীয় শশী মহারাজ, তাই মহারাজ মাদ্রাজে অবস্থান কালে যখন ২।১ দিনের জন্য একটু গম্ভীরভাবে শশীমহারাজের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন তখন তিনি তল্পি গুটিয়ে শ্রীশ্রীমহারাজের পাদপদ্মে প্রণত হয়ে বিদায় নিতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় মহারাজ হেসে বললেন, 'কি শশী ভায়া, কি খবর?' পূজনীয় শশী মহারাজ আর নিজেকে সামলাতে না পেরে বলে ফেললেন, 'রাজা তুমি কি

বোকা, তুমি কি জানো না তোমার প্রস্রাবে শত শশী ভেসে যায়? তুমি কিনা আমার উপর রাগ কর?' সে সব কথা তো আমরা বুঝি না। বোঝবার সাহস রাখি এমন ধৃষ্টতাও হৃদয়ে স্থান দিই না। প্রভুর বড় আদরের ছেলে ছিলেন তিনি। তাঁর মর্যাদা আমরা কি বুঝি? প্রভু সতত তাঁর সঙ্গে—সঙ্গে শুধু নয়, প্রভু তাঁর মূর্তিতে এই সঙ্ঘে বিরাজমান ছিলেন। তাঁর দর্শনে প্রভুর দর্শন। এসকল আমার মনের কল্পনা নয়, প্রলাপ নয়। একদিন পূজনীয় হরি মহারাজ শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে উঠলে ঢাকার বীরেন বসু যিনি কাছে ছিলেন তিনি স্পষ্টই বলে ফেললেন, 'একি মহারাজ, আপনারা ওঁর গুরুভাই, তবে আপনারা ওঁর ভিতর কি দেখলেন যে অমন করে প্রণত হলেন?' উত্তরে পূজনীয় হরি মহারাজ বলেছিলেন, 'কি দেখি জান, ঠাকুরকেই দেখি, তাইতো অমন করি।' আমাদের তো সে বোধ নাই। আমরা যে ঠাকুরকে দেখি না, তাই মহারাজ বলে জানি। স্বরূপ কি তিনি সকলের কাছে ব্যক্ত করেন? তিনি কি সকলকে আত্মস্বরূপ দেখান? অতি ভাগ্যবান যারা, তারা তাঁকে ঠাকুরের চলন্মূর্ত্তি জ্ঞানে দেখতেন ও সেইভাবেই ব্যবহার করতেন।

আর একদিনের কথা স্মরণ হয়। কাশীধামে ১৯২০ সালে শ্রীশ্রীমহারাজ ও পূজনীয় শ্রীশরৎ মহারাজ উভয়েই মোগলসরাই পর্যন্ত ট্রেনে এসেছেন। উভয়েই এক মোটরে মোগলসরাই থেকে ৺কাশীধামে পৌঁছবেন। সেদিন এক অপূর্ব ব্যবহার পূজনীয় শরৎ মহারাজ করলেন দেখলুম। পূজনীয় শ্রীশ্রীমহারাজ অদ্বৈত আশ্রমের হলঘরটির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন গেটের দিকে মুখ করে, আর পূজনীয় শরৎ মহারাজ তাঁর শ্রীমুখের দিকে তাকিয়ে শ্রীচরণস্পর্শ করে বলছেন, 'মহারাজ প্রণাম হই, কাশীতে প্রণাম (হই)।' সে ব্যাপার কিছু বুঝলাম না, তবে যেন একটা মাধুর্যমাখা সুন্দর ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত হল। সেসব দৃশ্য মধ্যে মধ্যে হৃদয়ে জেগে উঠে হৃদয়

নির্মল করে তোলে। আর একদিনের কথা স্মরণ হয়। ঐ কাশী-ক্ষেত্রেই সেবারে শ্রীশ্রীমহারাজ অদ্বৈত আশ্রমে দোতলার ঘরে বাস করেন আর প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা ধ্যান করেন। আর একসঙ্গে সমবেত আমাদিগকে কত সদুপদেশ দেন, কত জোর দিয়ে বলেন, 'বাবা কিছু কর্ দিকি, কিছু কর্, অন্তত তিনটে বছরও কর্ দিকি। কিছু না করলে কি হয়! না হয় ছ'মাসও কর্ দিকি একসঙ্গে।' কত আকুলভাব কিসে আমাদের কল্যাণ হবে। অমন সুহৃদ্ তো আর পাব না। যিনি শ্রীভগবানের পরম সুহৃদ্, যাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুর দেখেছিলেন ভাবে—গঙ্গার উপরে সুপ্রস্ফুটিত সহস্রদল (পদ্মে) কমলের উপর বিরাজমান বংশীধারীর লীলাসহচর রূপে, তিনি যে আমাদের সুহৃদ্, শুধু আমাদের কেন, সারা বিশ্বের সেকথা কি আর বলতে হবে? না, বলেই বোঝান যাবে? বোঝান তো যাবে না।

সেবারকার আর একদিনের ঘটনা মনে ভাসছে। পূজনীয় হরি মহারাজ তখন সেবাশ্রমে থাকেন, শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। রাত্রে নিদ্রা হয় না তাই দিবাভাগে সেবাশ্রমের সেবকদের বাসভবন অতিক্রম করে যে বাটীখানি সৌদামিনী ওয়ার্ড বলে পরিচিত সেখানে সচরাচর থাকতেন, আর রাত্রে ১০নং ওয়ার্ডে ঢুকেই দক্ষিণদিকের কোণের ঘরখানিতে নিদ্রা যেতেন। বৈকালে শ্রীশ্রীমহারাজ অদ্বৈতাশ্রম থেকে সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছেন। পায়চারি করতে করতে এগিয়ে আসছেন। সেবাশ্রমের এখন যেখানে অস্ত্রচিকিৎসাগার ঠিক ঐ স্থান একটু পার হয়ে এসেছেন, আর পূজনীয় হরি মহারাজ ১০নং বাটীর সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমি তাঁর পাশে। দেখলাম তিনি করজোড়ে পূজনীয় মহারাজকে সহাস্যে অভিবাদন করে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করতে লাগলেন। মুখে এককথা, 'প্রণাম, মহারাজ, প্রণাম; আসুন আসুন মহারাজ, আসুন।' সে অপূর্ব প্রেমের মিলন মনে হলে প্রাণ মেতে উঠে, মন ভরে যায়। তাইতো মহারাজের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের জনৈক বন্ধু যখন কোন সাধুর কথা তুলেছিলেন

পূজনীয় হরি মহারাজের কাছে, তখন তাঁর কি সদর্প বাণীই না শুনেছিলাম—কত দর্পভরে তিনি বলে উঠেছিলেন, 'তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই। ওঁরা কি সাধু? ওঁরা সাধুর উপরের জিনিস। ওঁদের সংকল্পে কত সাধু জন্মায়!' সে সব সোনার মানুষ আর চোখের সামনে দেখছি কোথায়! তাঁরা সব একে একে স্মরণের জিনিস হয়ে গেলেন।

কত কথাই না মনে পড়ছে এই প্রসঙ্গে সেই সেবার কাশী থেকে যেবার শ্রীশ্রীমহারাজ মঠে ফিরতে রাজি হননি—সেবারের কথা। কত পত্র, কত আবদার জানান হচ্ছে, কিন্তু তিনি অটল। সবাই হার মেনে গেল। সেবাকার্যের চাপে সাধু ব্রহ্মচারীদের কষ্ট হচ্ছে শুনে মহারাজ মঠে আর ফিরবেন না এই ইচ্ছা। তখন মঠের কর্ত্রী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—মঠের রাজা মঠে না এলে কি মঠ মানায়! পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ আর থাকতে পারলেন না। একেবারে বিশ্বনাথধামে—বিশ্বনাথকে কৈলাশ থেকে নামিয়ে নিয়ে আসতে গেলেন। নিয়ে আনবার আর উপায় কি, বিশ্বনাথকে হৃদয়ের আর্তি জ্ঞাপন করা ছাড়া? সাধ্যমত সে আর্তি জানান হল। শিব তো অটল—কিছুতেই নামবেন না। তখন শেষ মিনতি করা হল। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ একেবারে স্বর্ণকাশীর স্বর্ণভূমিতে সাষ্টাঙ্গ হয়ে বিশ্বনাথের যুগলচরণ ভুজযুগলে জড়িয়ে ধরলেন। আশুতোষ ভক্তের নিবেদন কি উপেক্ষা করতে পারেন? একেবারে তখনি রাজী। 'চল ভাই, চল, আমি যাব যাব যাব।' তখনই সব স্থির হয়ে গেল। পূজনীয় মহারাজের পারিষদ-অগ্রণী পূজনীয় অমূল্য মহারাজকে হুকুম হল 'চল অমূল্য চল, মঠে যেতে হবে।' কোথাও যেতে হলে কত পাঁজি-পুথি দেখা, কত দিন-ক্ষণ দেখা যাঁর কথায় কথায় ছিল, ভক্তের কাতর আহ্বানে আজ তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন, ভক্তের কাতর আহ্বানে আজ সে সব ভুল হল। ভোলানাথই এমন ভুল করে থাকেন! কত আঁট-সাঁট, কিন্তু এক কথায়, তাঁর সব ভুল

হয়ে যায়। ভক্তের ডাক তাঁর কাছে বড় ডাক মনে হয়। এসব কথা মনে হলে ইচ্ছা হয় একবার প্রাণভরে সেই বিশ্বনাথ, সেই আমাদের ঘরের বিশ্বনাথকে ডাকি, ডেকে দেখি বিশ্বনাথের সাড়া পাই কিনা। আপনারা মনে করবেন না আমি গোঁড়ামি করে, অতিরঞ্জিত করে, কল্পনার সাহায্যে শ্রীশ্রীমহারাজকে বিশ্বনাথের আসনে বসিয়ে ভক্ত সাজার অভিপ্রায়ে ভক্তির আতিশয্য করছি। শ্রীশ্রীমহারাজকে বিশ্বনাথ বলে যিনি জানতেন সেই পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজের শ্রীমুখে একথা শ্রীশ্রীমহারাজের সামনেই বলতে শুনেছি। একদিন পায়ে বাতের বেদনায় বড় কাতর হয়ে পূজনীয় শরৎ মহারাজ যখন শ্রীমন্দিরে বিশ্বনাথ দর্শনে যেতে পারেননি তখন ধীরে ধীরে নিজ বাস হতে (কিরণবাবুর বাটীতে কাশীধামে থাকতেন) এসে অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীনিকেতনে প্রবেশ করে ঠিক ঐ কথা বলেছিলেন, 'মহারাজ আজ বাত বেড়েছে বলে বিশ্বনাথ দর্শনে যেতে পারিনি। তাই তোমায় দেখতে এলুম।' এখনো যেন আমার সেই মধুর গম্ভীর বাণী মনে পড়ছে। আর শ্রীশ্রীমহারাজ নীরব ভাষায় ইঙ্গিতে বললেন, 'বস ভাই, বস।' এসব লীলা কে বুঝবে? কেই বা বোঝাবে? এসব লীলা তো বোঝা যাবে না।

সেবারকার আর একদিনের ঘটনা বলি—শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমূর্তি (পট) খানির বদলে নূতন মূর্তি বা নূতন পট স্থাপন হবে। যোগিরাজ তাঁর স্বাভাবিক ক্রিয়াকাণ্ডগুলি নিয়ে ব্যস্ত। শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিষেক হচ্ছে। এমন সময় আমাদের মহারাজ সপারিষদ সেখানে উপস্থিত। আমার উপর 'রুদ্রাধ্যায়' পড়ার আদেশ হয়েছে। পারি আর না পারি, ভাল লাগে তাই তারস্বরে 'রুদ্রাধ্যায়' পড়ছি। এমন সময় মহারাজের আদেশে কীর্তন আরম্ভ হল। সেখানে পূজনীয় নীরদ মহারাজ, বরদানন্দ, জ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি সব বড় বড় গাইয়ে উপস্থিত। পূজনীয় হরি মহারাজও সেখানে ছিলেন।

সবাই গান ধরেছে, কিন্তু শ্রীমহারাজের তাতে তেমন তৃপ্তি হচ্ছে না, তাই সহসা দেখলুম সেই শ্রীমূর্তি তাঁর সেই প্রশান্ত চিরগম্ভীর সুস্মিত-বদন, সেই বিশাল বক্ষ, বিশাল নেত্র, বিশাল উন্নত কলেবর নিয়ে আবেগভরে লম্ফপ্রদান করতঃ নৃত্য আরম্ভ করলেন। নটরাজ স্বধামে কি এমনি উদ্দাম নৃত্য করে থাকেন! তার পর যা হল মুখে বলা যায় না। আনন্দের কুলকিনারা নেই। থৈ থৈ করছে আনন্দ, সবাই সে আনন্দে গরগর। এত আনন্দ যে পূজনীয় হরি মহারাজ যাঁর চলবার সামর্থ্য নেই, তিনিও হাত নেড়ে শরীর কাঁপিয়ে নৃত্যানুকরণ করতে লাগলেন। এই ঘটনার পর সেই দিন বৈকালে শ্রীশ্রীমহারাজকে দেখতে গেলুম, তিনি উপরের বারান্দায় নিজ কক্ষের সম্মুখে আসীন আছেন। আমি তাঁর শ্রীচরণে প্রণত হয়ে সেই নিভৃতে যেমন বললুম, 'মহারাজ কি যে আনন্দ হয়েছিল আজ, কি আর বলব! শুধু আজ নয়, আপনি যেদিন থেকে এসেছেন সেই দিন থেকে আনন্দের হাট বাজার বসে গেছে। আনন্দ তো আর ধরে না।'—সেই আনন্দময় মূর্তি স্বাভাবিক স্মিতবদনে আমার কথা সমর্থন করে বললেন, 'বাবা, চৈতন্যের উন্মেষ হলে অমনি আনন্দ হয়ে থাকে।' কি যে চৈতন্য তা কি বুঝি তবে আনন্দটুকু যে পাই তা তো অস্বীকার করবার যো নেই। তাঁর সামীপ্যে যে আনন্দ হত একথা তাঁর ভক্তমাত্রেই জানেন। তিনি নীরব মানুষ—তাঁর সব নীরব। কাছে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত—কিন্তু উঠে আসতে পারা যেত না। আমাদের অনেকেই কি সে কথার সাক্ষ্য দেবেন না? কিছু হচ্ছে না, কোন উপদেশ মুখে নাই, বরং গল্পগুজব হাসিঠাট্টা চলেছে তবু তো ছেড়ে আসতে প্রাণ চাইত না। ব্যাপারটা কি! পুঁথি-পত্তর তো বড় ঘাঁটতেন না। যদিই বা কখন একটু আধটু তন্ত্র-মন্ত্র বা পুরাণাদি দেখতেন—তা সে দেখার মধ্যেই বা কি একটা অপূর্ব শ্রদ্ধার ভাব। হাতে গঙ্গাজল নিয়ে গুরুইষ্ট স্মরণ করে অতি সন্তর্পণে শাস্ত্রখানি

খুলতেন কত যত্ন করে। দেখলে মনে হত শাস্ত্র বা বুঝি চেতন জিনিস। তারও বুঝি শরীর অতি কোমল, অতি কোমল! তবে সব জিনিস চেতন, এটা যে তিনি দেখতেন তা তাঁর শ্রীমুখে শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

একদিনের কথা মনে পড়ছে। তখন মঠে খুব যাতায়াত করি—আমার শরীরটা খারাপ। পূজনীয় মহারাজ আমায় একটা ওষুধ দেবেন ঠিক হল। বললেন বাবুরাম মহারাজকে ডেকে, 'ভাই, ঐ গাছটার মূল ওকে দাও। আমি তো তুলতে পারব না। সব চেতন দেখছি।' তখন পূজনীয় হরি মহারাজ ও পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ উভয়ই মঠে ছিলেন। এ ঘটনা ঘটেছিল গেটের পাশে যে পুষ্করিণীটি আছে সেইখানে দাঁড়িয়ে। আরও অনেক কিছু যে তিনি চেতন দেখতেন তা সময়ে সময়ে তাঁর শ্রীমুখ থেকে শোনা যেত। একবার ভুবনেশ্বরে জঙ্গলের দিকে বেড়াতে বেড়াতে যেমনি একটা পুষ্পিত বৃক্ষের সম্মুখীন হয়েছেন, অমনি দেখলেন সেখানে সেই বৃক্ষটি তাঁকে আহ্বান করে বলছে: 'আসুন আসুন, এই গন্ধ আঘ্রাণ করুন'। এসব ভাবরাজ্যের কথা—ভাবরাজ্যের রাজার ছেলের মুখেই শোভা পায়। তিনি কতবার উপদেশ দেবার সময় আমাদের বলেছেন, 'ওরে বাবা, এ একটা রাজত্ব আর সে একটা রাজত্ব। এ রাজত্বে থেকে সে রাজত্বের কথা বোঝা যায় না।' এমনও শুনেছি তিনি বলেছিলেন: 'লোকে বলে নির্বিকল্প সমাধি শেষ কথা—কিন্তু আমার মনে হয় ঐখানেই ধর্মের অনুভূতির দ্বার উন্মুক্ত হল। তারপর কত অনুভূতি করবে কর। অনন্ত, অনন্ত—তার কি ইতি আছে।' ভাবলে মন কোথায় অনন্তে লীন হয়ে যায়। মন-বুদ্ধি একধারে পড়ে রইল, তবে তো সে রাজত্ব আরম্ভ হল। মনের গণ্ডি কাটিয়ে উঠতেই বাই জন্মে যায়, তারপর তো অন্য কথা। এই অনন্তের কথা বলতে বলতে শ্রীশ্রীমহারাজ (কাশী থাকা-কালীন) একদিন কি যে মেতে গিয়েছিলেন তা আর মুখে কি বলব! তাঁকে ধ্যানের পর সেই

প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তিতে যিনি দেখবার সৌভাগ্য করেছেন, তিনি জানেন সে মূর্তি কেমন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! যেন হিমালয়ের মত শীতলতা নিয়ে উন্নতশিরে তিনি উপবিষ্ট আর তাঁর পাদদেশে আমরা বসে আছি আমাদের তৃষিত-হৃদয় শান্ত করব এই আশায়। আমরা যেন সেই মহান্ বটবৃক্ষের মূলে, সেই বিচিত্র পাদপের স্নিগ্ধ শীতল ছায়ায় বসে আছি আর নীরব ভাষায় তিনি আমাদের দেহ-প্রাণ জুড়িয়ে দিচ্ছেন—সেসব কথা স্মরণ হলে এখনো হৃদয় ভরে যায়। সেই অমৃতময় শ্রীমূর্তি ধ্যানস্থ, আর আমরা সেই অমৃতের সিন্ধুর তীরে অমৃতপানে পরিতৃপ্ত। সে দৃশ্য কি ভোলা যায়? সে যে প্রাণ-জুড়ান মূর্তি, প্রাণ অধিকার করে বসে আছেন! সুন্দরের কি সকলি সুন্দর! তাই তাঁর মোহন স্মিত হাস্যটুকু মনে হলে মনে হয় এমন সুমধুর হাস্যও দেখিনি। সেই নিজের আসনে বসে একটু একটু ধূমপান করছেন আর সময়ে সময়ে আত্মহারাভাবে ভোলানাথ-নাথ হয়ত শুধুই নলটি মধ্যে মধ্যে চুম্বন করছেন এবং কি এক অজানা দেশে অজানা মানুষের সঙ্গে মত্ত হয়ে অজানা জিনিস উপভোগ করছেন---সেসব কথা স্মরণ হলে মন যে আমাদেরও সে দেশে ছুটে যায়। সে দেবমধুর ধ্যানমঙ্গল মূর্তি একবার হৃদয়ের ধ্যাননেত্রে আপনারা উপভোগ করে হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করুন। চিরসন্তাপহর সেই মূর্তি, স্মরণ-মঙ্গল সেই মূর্তি একবার স্মরণ করুন। স্মরণমাত্রেই যে আমাদের হৃদয়ের সকল জ্বালা আপনা থেকে মিটে যায়। আমরা আজ এই শুভ বাসরে—তাঁর স্মরণীয় শুভ জন্মতিথি-বাসরে তাঁর শ্রীমূর্তি হৃদয়ে ধারণ করে সবাই মিলে ধ্যানস্থ হই। ধ্যান কি আর আমাদের শেখাতে হত। ধ্যানই যে তাঁর সহজ অবস্থা ছিল। আসুন, সেই ধ্যানস্থ পুরুষের 'আপদি ধ্যেয়ম্' মূর্তিকে আমাদের ধ্যাননেত্রে আজ নিরীক্ষণ করে সকল বিঘ্নের মস্তকে আমরা দণ্ডায়মান হই। তাঁর বিস্মৃতিই তো পরম আপদ। আজ সেই বিস্মৃতির বুকে আমরা সবাই সদর্পে দণ্ডায়মান হয়ে আনন্দময়

পুরুষের সুভগ সুন্দর গতি, সুভগ সুন্দর স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করে ধন্য হই। তাঁর স্মৃতিই যে জাগরণ, তাঁর বিস্মৃতিই যে মরণ। আমরা অমৃতের সন্তান আজ জাগ্রত হয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করে ধ্যানে ভগবানের শ্রীমূর্তি নিরীক্ষণ করে ধন্য হই।

কত কথাই না মনে পড়ছে তাঁর সম্বন্ধে। মনে পড়ছে উৎসবানন্দে তাঁর শ্রীমূর্তিখানি। তাঁর জন্মোৎসব এমনি দিনে, এই বসন্তের সমাগমে। কাশীধামে—সেই তাঁর লীলা একবারকার মনে আছে। পূজনীয় সুধীর মহারাজকে সাজিয়ে গুজিয়ে দাঁড় করিয়ে সবাই মিলে জ্ঞানেশ্বরাদি গান ধরেছে, আরতি করছে। পূজনীয় সুধীর মহারাজ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তিনি দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কত আনন্দে, কত রহস্যপূর্ণ কথায় আমাদের আনন্দে পাগল করে তুলছেন। সে সব কি ভোলা যায়? ভোলানাথের সব ভুল হয় বটে কিন্তু ভক্তকে কৃপাদানে কখন বিস্মৃতি দেখিনি। যখনই গেছি তখনই কত আনন্দ দানে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে উঠে সেই মধুররবে কখন 'গোবিন্দ মধুসূদন', কখন 'শ্রীদুর্গা' 'শ্রীদুর্গা' বলে আনন্দ করছেন। 'জাগনেওয়ালা জাগো শুননেওয়ালা শোন' বলে কি অমৃতবর্ষণ করছেন। মনে হয় এখনো তেমনি করে বুঝি তিনি সেই লীলা করছেন। (যীশু) ঋষি কৃষ্ণের সেই বাণী মনে জাগে—'He that hath ears to hear, let him hear।' কান থেকেও যে আমাদের কান নেই, তাইতো তাঁর বাণী শুনেও শুনি না। তিনি তো আমাদের জাগাবার জন্যে সদা উদ্গ্রীব ছিলেন, কিন্তু আমরা জাগি কই? তবে আজ তো আর না জেগে উপায় নেই। তিনি যে জাগাবেনই স্থির করেছেন—আজ তো জাগাবেনই। তখন মনে ভাবতুম বুঝি মহারাজের সেজেগুজে আমোদ করার বাসনা হয়েছে তাই শুভ জন্মতিথি-বাসরে অত সেজেছেন, ফুলসাজে সেজেছেন। তিনি তো সাজবেনই, বলরামের লীলার সাথী একটু সাজলেনই বা

ক্ষতি কি? কিন্তু আমাদের কল্যাণের জন্যই যে সাজছেন তা কি বুঝেছিলাম?—না এখনো বুঝি? তবে এখন এইটুকু বুঝি যে, সেই শ্রীমূর্তিতে আমাদের হৃদয়পটে আরূঢ় হয়ে আমাদের ধ্যানের সহায়তা করবেন বলেই ঐ সাজে সজ্জিত হতেন। দেবতাদেরও তো শিঙার বেশ হয়। তিনি কি দেবতাদের চেয়ে কম? আমাদের হৃদয়ের দেবতা তো তাঁরাই ছিলেন। আসুন, আজ এই মধুর মিলনের দিনে আমরা আমাদের হৃদয়ের দেবতাকে হৃদয়ে রেখে একবার প্রাণ জুড়াই, প্রাণ শীতল করি। তিনি তাঁর লীলালাস্য-নেত্রে আজ আমাদের অন্তরের চক্ষুর অন্তরে বিরাজ করুন এই প্রার্থনা আমাদের। তিনি যেমন তখন লীলা করেছেন—আমাদের সেই দৃষ্টি দিন, আমরা এখনো তাঁর সেই লীলার মাধুর্য ঠিক তেমনি করে, তেমনিভাবে উপভোগ করি। সকল মাধুর্যের ঘনীভূত মূর্তিই যে তিনি ছিলেন—সে কথা তো কল্পনা নয়! তিনি যে মধুর, অতি মধুর তা তাঁর সকল অবস্থার মূর্তি ধ্যানে প্রকটভাবে বোঝা যায়। তাঁর উজ্জ্বল সপ্রেম করুণ দৃষ্টিপূর্ণ মুখমণ্ডল একবার স্মরণ হলে, তিনি যে মূর্তিমান মাধুর্য ছিলেন এ কথার সত্যতা বুঝতে আমাদের দেরি হয় না। সেই শ্রীমূর্তিতে যখন শ্রীশ্রীপ্রভুকে নিবেদিত মাল্যাদি এনে শোভিত করা যেত তখন যে কি অপরূপ শোভা হত, সেকথা আর কি বলব! যেন কন্দর্পের দর্পও চূর্ণ হয়ে যেত, মদনের মদও খর্ব হত। মদনমোহনের সাথী তিনি, তাঁর নিকট মদন হার মানবে এ আর বিচিত্র কি! আজ তাঁর এই শুভ জন্মতিথি-বাসরে হে প্রেমিক, হে রসিক, হে ভক্ত, এস ভাই, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রাণের প্রেমফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে বিদায় নিই।*

ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু

---

* স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ভবানীপুর গদাধর আশ্রমে ১১ই ডিসেম্বর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ভক্তসম্মেলনে পঠিত।

ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গ

২

মহারাজ বললেন—পাখিটা মাস্তুল ছেড়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় তারপরে মাস্তুল সার করে। মহামায়া সব জায়গায় ঢুকে আছেন, মায় সাধুর কৌপীনের মধ্যে, গেরুয়া কাপড়ের ভিতর পর্যন্ত। তিনি পাঁচরকম জিনিসে আমাদের ভুলিয়ে রেখেছেন, মান যশ ইত্যাদি। ওসব ছাড়িয়ে যাওয়াই কঠিন। কিন্তু ভগবানের কৃপা যার উপর হয় তার ভগবানের দিকটা প্রশস্ত হয় আর নিজের দিকটা অণু হয়ে আসে, শেষে নিজের সত্তাটা এত ছোট বোধ হয় যে 'নেই' হয়ে যায়।

ঠাকুর বলতেন, 'অহংকার যাবার একটা উপায় ওপর দিকে তাকান। সব জিনিসেরই তারে বাড়া তারে বাড়া আছে, সেটা দেখলেই নিজের ক্ষুদ্রত্ব বোধ হয়।' তা না হয়ে যার বোধ হল নিজেই একটা কিছু হয়ে পড়েছে তার উন্নতি একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। ঠাকুরের একবার মনে হয়েছিল যদি আমি পাইখানা সাফ্ করতে পারি তবে বুঝব অহংকার গেছে। যেই মনে হওয়া অমনি রাতারাতি পাইখানা সাফ্ করে এলেন। এসে বললেন—'মন এইবার হয়েছে!' আমি সেদিন বিশ্বনাথ দর্শনে গেছি সঙ্গে দু-পাঁচ জন আছে, বেশটা বেশ সুন্দর তারপর 'স্বামী' পদবাচ্য হয়েছি। সামনে দেখলুম বিশ্বনাথের আঙ্গিনায় একজন ঝাড়ু দিচ্ছে। দেখেই মনে হল, এই তো ঠিক অবসর এখন যদি ঝাড়ু দিতে পারি তবে বুঝব হয়েছে। অমনি লোকটাকে বললুম—'তোকে একটা পয়সা দেব ঝাড়ুগাছাটা দে তো' (কারণ সাধু দেখে দিতে চাইছিল না)। অমনি তার হাত থেকে ঝাড়ুগাছাটা নিয়ে ঝাড়ু দিলাম। তারপর

মনে এমনি একটা আনন্দ হল দুটি ঘণ্টা ধরে যে বলতে পারি না। প্রাণ ভর হয়ে রইল। দীনতার এমন একটা আনন্দ আছে যে তা মুখে বলা যায় না। বিশ্বনাথ দর্শনে যে আনন্দ হয়েছিল মন্দির মার্জনায় তার চেয়ে বেশী হল। *

* ১৯২০ সালে কোন একসময়ে শ্রীশ্রীমহারাজ উপরি-উক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

শিবানন্দ-প্রসঙ্গ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজার সূচনা

স্বামী শিবানন্দজীর নিকট শ্রুত

কাশীপুরের বাগানে শশী মহারাজ ঠাকুরের প্রাণপাতী সেবা করিতেন। শরৎ মহারাজ কালী মহারাজ প্রভৃতিও তাঁহার সেবা করিতেন। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ নীচে থাকিতেন। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের সেবার জন্য ভার্মিসিলি ইত্যাদি তৈয়ারি করিতেন। একজন রসুইবামুন সেবকদের আহারাদি প্রস্তুত করিত। মাঝে মাঝে গাঁজাখোর বামুন আসায় তাড়াইয়া দিতে হইয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে পূজনীয় মহাপুরুষ সকলের জন্য অন্নাদি তৈয়ারি করিয়াছিলেন। কখনো মাসাধিক কালও তাঁহাকে এইরূপ করিতে হইয়াছে। কাশীপুর বাগানে ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৮৮৬র আগস্ট এই নয় মাস শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন। স্বামীজী এই সময়ে খুব সাধনভজন করিতেন। তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিচর্যাও করিতে হইত। রামবাবুদের বাড়িতে থাকার সময় মহাপুরুষজী নিজে রান্না করিতেন, তাহাও অল্প চাপাইয়া নামাইয়া লইতেন মাত্র। বিশেষ যে রাঁধিতে জানিতেন তাহা নহে। এবং তাহাও রামবাবুদের বাড়ির মেয়েরা এমনভাবে চালে জল দিতেন যে ফেন পর্যন্ত গালিতে হইত না। তাঁহাদের তৈয়ারি ব্যঞ্জন গ্রহণ করিতেন। ঠাকুর বলিতেন, 'কলিতে অন্নটাই যা দোষ।' মহাপুরুষ বলিতেন যে তিনি উপরে বড় যাইতেন না বটে কিন্তু সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন যদি কাজের দরকার পড়ে তবে উপরে যাইবেন।

যাহা হউক শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোভাবের পরে তাঁহার পূতদেহের ভস্মাস্থিশেষ একটি কলসিতে করিয়া তাঁহারা কাশীপুরের বাগানে লইয়া আসেন। সেখানে একটি মহাসমস্যা উপস্থিত হইল, তাঁহারা

ঐ কলসিটি লইয়া কোথায় যাইবেন। তখন তাঁহাদের মাথা-গোঁজার একটু স্থান নাই, কোথায় বসা-দাঁড়ান যায় কোথায় খাওয়া-শোয়া যায় তাহার পর্যন্ত স্থান নাই। গঙ্গাতীরে (চিরপ্রচলিত প্রথানুযায়ী সমাধি দিবার জন্য) তাঁহারা স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে অধিক টাকা সংগ্রহ করাও তাঁহাদের পক্ষে তৎকালে অসম্ভব ছিল। দুই-তিন হাজার টাকা সুরেশবাবু বলরামবাবু প্রভৃতি মিলিয়া দিতে পারিতেন বটে কিন্তু তাহাতে সুবিধামত জায়গা মিলিল না। জমি দেখা হইল মালপাড়া বরাহনগর জয়মিত্তিরের কালীবাড়ির পাশে, তাহাও চোদ্দ-পনের হাজার টাকার মত দাম। সুতরাং সে আশা ত্যাগ করিতে হইল। এদিকে বলরামবাবুর পিতা তাঁহাদের বৃন্দাবনের কুঞ্জে বাস করিতেন, তাঁহার নিকট হইতে ব্যবস্থা লওয়া হইল সমাধি না দিয়া যদি শুধু ঐ অস্থি কোন পাত্রে রক্ষিত হইয়া পূজাদি করা যায় তাহা হইলে কোন দোষ হয় কিনা। তিনি জানাইয়া পাঠাইলেন যে না তাহাতে কোন দোষ নাই, তবে একটি মহোৎসব করিয়া ঐরূপভাবে রাখা যাইতে পারে। বলরামবাবুর ঐ কথা সকল ভক্তমণ্ডলীকে বিজ্ঞাপিত করায় মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল। নিত্যগোপালবাবু বলিলেন, 'তর্কের উপর তর্ক আছে।' তখন অগত্যা স্থির হইল যে রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কাঁকুড়গাছিস্থ উদ্যানে উহা সমাহিত করা হইবে। নির্দিষ্ট দিনে উহা লইয়া গিয়া রামবাবুর বাড়িতে রাখা হইবে, পরে তথা হইতে উহা তাঁহার বাগানে লইয়া গিয়া যথাবিধানে উপযুক্ত স্থানে শুভক্ষণে সমাহিত করা হইবে। এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধানের পর স্বামীজীর মনে ভয়ানক একটা ঝড় উঠিল। তিনি সর্বদাই ভাবিতে লাগিলেন, 'কি করা যায়, কোথায় ঐ অস্থি রাখা যায়। ওঁরা (গৃহীভক্তগণের অধিকাংশই, কেবল বলরামবাবু ছাড়া; তিনি এঁদের ছোকরাদের দিকেই ঝুঁকিয়াছিলেন, অবশ্য তিনি প্রকাশ্যে কিছু বলিতেন না, কারণ তাঁহার পিতৃদত্ত ব্যবস্থাই যখন

উপেক্ষিত হইল, তখন তাঁহার পক্ষে কোন মতামত না দেওয়াই সমীচীন ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক) তো একটা ঠিকঠাক করে ফেললেন। কই আমার তো মনে ধরছে না।' এইরূপ ভাবিয়া (গৃহীভক্তরা স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলে) নিজেদের মধ্যে তিনি মনোভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। তিনি নিজেই ঘড়াটি হইতে সমুদায় বস্তু একটি কাপড়ে ঢালিয়া ফেলিলেন। উহা হইতে একটি ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড লইয়া গুঁড়াইয়া স্বয়ং উদরস্থ করিয়া বলিলেন, 'হ্যাখ ও দেশে (তিব্বতে) বড় বড় লামাদের অস্থিকণা এরকম খেয়ে থাকে। আয় তোরাও একটু একটু খা।'—এই বলিয়া উপস্থিত গুরুভাইগণকে ঐরূপে খাওয়াইলেন। পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী বলেন ঐরূপে সেই পূতদেহের অস্থিকণিকা উদরস্থ হওয়া মাত্র দেখা গেল শ্রীশ্রীস্বামীজীর ঘোর মাতালের মতো নেশা সমুপস্থিত হইল। তিনি নিজেও ঐরূপে গ্রহণ করায় ঐরূপ একটা মত্ততা সেইদিন অনুভব করিয়াছিলেন। তাহার পর বলরামবাবুকে একটি পাত্র আনার কথা বলায় তিনি পরদিন একটি তাম্রময় পাত্র বা কৌটা (যাহা আজিও আত্মারামের কৌটা নামে আমাদের সঙ্ঘের আরাধ্য দেবতা বলিয়া পরিচিত) আনেন এবং ঐ ভস্মাস্থিশেষের প্রায় সমুদায় অন্তত: অধিকাংশই উহাতে রক্ষিত হইল এবং স্বামীজীর অভিপ্রায় অনুযায়ী যৎকিঞ্চিৎ ভস্মাবশেষ সেই কলসিটিতে রাখিয়া পূর্বের মতোই বন্ধ করিয়া রাখা হইল। এই ব্যাপার অতি গোপনে করা হইল। পরে ঐ কৌটাটি বলরামবাবুর বাটীতে তাঁহাদের জগন্নাথ বিগ্রহের পাশে রক্ষিত হইয়া পূজিত হইতে থাকে। বলরামবাবুদের পূজারী ফকিরবাবুই উহার পূজা নিয়মিত করিতে থাকেন। ১৮৮৬ সালের আগস্ট হইতে ডিসেম্বর এই কয়মাস উহা ঐখানেই ঐভাবে ছিল।

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজই প্রথম বরাহনগর মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহৃত মাদুরের উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি পটে ফুল দিতে এবং দিনে অন্নভোগাদি ও রাত্রে দুধ ও কিঞ্চিৎ বাতাসাদি

ভোগ দিতে শুরু করেন। পরে শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজের দেশ আঁটপুর হইতে ২৪শে ডিসেম্বর খৃষ্টমাস ঈভ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত নবসঙ্ঘের ত্যাগীমণ্ডলীর মধ্যে পূজ্যপাদ শশী মহারাজই বলরাম মন্দির হইতে আনীত শ্রীশ্রীআত্মারামের কৌটার (একটি টুলের উপর রক্ষিত) পূজা করিতে আরম্ভ করেন।

রামকৃষ্ণানন্দ-প্রসঙ্গ

ভূমিকা

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীশশী মহারাজ বলিতেন: 'একমাত্র গুরুসেবা দ্বারাই সব হয়।' তিনি নিজ জীবনে এই মহাবাক্যের সত্যতা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অক্লান্তভাবে এবং একনিষ্ঠ হইয়া তিনি স্বীয় প্রাণের আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা করিতেন। এই সেবা পরমহংসদেবের জীবিতকালে প্রত্যক্ষভাবে এবং তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার ভাবময় বিগ্রহ অবলম্বনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র ত্রুটি আলস্য বা ঔদাসীন্য কখনও তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হয় নাই। ইহাই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল। এবং উহা বুঝিতে পারিলেই আমরা তাঁহার জীবনবেদের মর্মোদ্‌ঘাটনে সমর্থ হইব।

তাঁহার ঐহিক দেহত্যাগের কিছু পূর্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর বাগবাজারস্থ ভবনে অসুস্থ অবস্থায় তাঁহাকে দুই-একবার দূর হইতে দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত তদীয় গুরুভ্রাতা পূজ্যপাদ শ্রীমৎ প্রেমানন্দ-স্বামীর মুখে বহুবার তাঁহার পূতচরিত্রের কাহিনী শ্রবণ করিয়াছি। তিনি প্রায়ই আমাদের প্রাণে অগ্নিময় উৎসাহ সঞ্চার করিয়া বলিতেন—'ওরে তোরা শশী মহারাজের একখানি জীবনী লেখ্‌। ওদেশে (অর্থাৎ মান্দ্রাজ অঞ্চলে) গিয়ে তাঁর অদ্ভুত প্রভাব যা দেখে এসেছি সে কথা মুখে আর কি বলব! তিনি ওদিককার দিক্‌পাল ছিলেন। তোরা তাঁর জীবনী আলোচনা কর্‌।' এই উৎসাহবাক্যে প্রণোদিত হইয়াই সেই সমুদ্রবৎ অগাধ গম্ভীর ও আকাশের ন্যায় অসীম ও বিরাট মহাপুরুষের জীবনকথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ভরসা তাহার শুভাশিস। আমি তঁাহার সংস্পর্শে আসিয়া যে ভাব লাভ করিয়াছি তাহা যথাসাধ্য এই গ্রন্থে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিলাম এবং তৎসম্বন্ধে তঁাহার গুরুভ্রাতাগণ ও মঠের অন্যান্য সাধুগণের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাও এইসঙ্গে প্রকাশিত হইল। যদি এতদ্দ্বারা পাঠকগণ সেই মহাপুরুষের মহান্ চরিত্রের কিঞ্চিন্মাত্রও ধারণা করিতে সমর্থ হন তবে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। *

গ্রন্থকার

---

* স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অসাধারণ জীবনের পর্যালোচনা এযাবৎ অতি অল্পই হইয়াছে। বাংলা ভাষায় বহুদিন পূর্বে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তাঁহার একখানি জীবনচরিত রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এতদ্ভিন্ন স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁহার 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' গ্রন্থে সংক্ষেপে তাঁহার জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু বাংলা জীবনী-সাহিত্যে এই অসাধারণ মহাপুরুষের একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনীর অভাব দূরীভূত হয় নাই। ইংরাজীতে The Story Of A Dedicated Life নামে মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু তাহাকেও পূর্ণাঙ্গ জীবনী বলা যায় না। Sister Devamata তাঁহার Days In An Indian Monastery গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাকে যেমন দেখিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকেও জীবনী বলা যায় না। স্বামী কমলেশ্বরানন্দ বহুকাল পূর্বে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের একখানি বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার পরিকল্পনা করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তথ্যও সংগ্রহ করিতে থাকেন। এই তথ্যগুলি অনেকটা স্মৃতিচারণার আকারে সংগৃহীত হইতে থাকে। তাঁহার রচিত ভূমিকাটি পাঠ করিলে পাঠক ইহা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু অকালপ্রয়াণ তাঁহার সেই শুভসংকল্পকে বাস্তবে রূপায়িত হইতে দেয় নাই। তিনি তথ্যগুলি যেমন যেমন সংগ্রহ করিয়াছিলেন আমরা পাঠকদিগের নিকট তাহাই উপস্থাপিত করিলাম। যিনি ভবিষ্যতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত জীবনচরিত রচনা করিবেন তিনি ইহাকে আকরগ্রন্থ হিসাবে ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইবেন। আমরা আশা করি এই রচনাটি পাঠ করিলে পাঠকবর্গের সেই অলোকসামান্য জীবনের ঘটনাবলী অনুধ্যানের পথ সুগম করিবে এবং তাঁহারা বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন। —সঃ

রামকৃষ্ণানন্দ-প্রসঙ্গ

১

স্বামী সচ্চিদানন্দ

আলমবাজার মঠে থাকাকালীন

স্বামীজী প্রথমবার আমেরিকা হইতে আসিবার পূর্বে আমি শশী মহারাজের সহিত প্রায় দেড়-দুই বৎসর থাকিয়া তাঁহাকে যেভাবে দেখিয়াছি এবং তাহার সম্বন্ধে আমার যতদূর মনে আছে যথাসাধ্য লিখিবার চেষ্টা করিলাম। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থূল শরীর ত্যাগের পূর্বে যেভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন পরেও সেই-ভাবেই বরাবর তাঁহার সেবা করিয়া গিয়াছেন। সকালবেলা ঘর পরিষ্কার করিবার সময়ে আমার সহিত তাঁহার একবার বচসা হয়। তাঁহার বিরক্তির কারণ আমি বুঝিতে না পারায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ও তিনি বলিয়াছিলেন, 'ঘর ঝাড়ু দিবার সময় জল ছিটাইয়া না লইলে ধুলা ঠাকুরের শরীরে লাগিয়া যায়।' একদিন তিনি আমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখ ধুইবার দাঁতন থেঁতো করিয়া দিতে বলেন। আমি থেঁতো করিয়া দিলে তিনি তাহা হাতে লইয়া আমাকে ফেরত দেন এবং বলেন, 'দাঁতন খুব নরম হওয়া চাই, তাহা না হইলে তাঁহার মাড়িতে লাগিবে।' আর একদিন আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার বাসন মাজিতেছিলাম, তাহাতে বাসনে বাসনে ঠোকাঠুকি লাগিয়া শব্দ হইতেছিল। তিনি তাহা শুনিতে পাইয়া আমাকে বলিলেন, 'ঠাকুরের ঘরের সম্মুখে ওরূপ শব্দ যেন না হয়। ওসব শব্দ তিনি পছন্দ করিতেন না।' তাঁহার ঠাকুরসেবার প্রতি এতটা আগ্রহ ছিল যে যদি কখনও কোন নিয়মের ব্যতিক্রম হইত তাহা হইলে উন্মাদের মত হইয়া যাইতেন এবং আমার দেখিয়া মনে হইত যেন তিনি হৃদয়ে বিশেষ কষ্ট

অনুভব করিতেছেন। একদিন আমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের পান তৈয়ারি করিবার ভার দিলেন। সে পান তিনি খাইয়া বলিলেন, 'পানে চুন বেশি হইয়াছে।' তাহার পরও কয়েকদিন আমি পান তৈয়ারি করিলাম বটে, কিন্তু তিনি বলিলেন, 'তোমার পান তৈয়ারি করা উচিত নহে।' তখন অভেদানন্দ-স্বামীকে আমি সব বলাতে তিনি বলিলেন, 'আমি তৈয়ারি করিয়া দিব।' তাহাতেও চুন বেশী হওয়াতে তিনি বলিলেন, 'তুমি বাহিরের পান তৈয়ারি করিবে।' মাস দুই-তিন আমার দ্বারা অনেকগুলি করিয়া বাহিরের পান তৈয়ারি করাইয়া একদিন বলিলেন, 'এখন হইতে তুমি ঠাকুরের পান তৈয়ারি করিবে।' সেইদিন ঠাকুরের একটি প্রসাদী ফুলের মালা দিয়া আমাকে বলিলেন, 'তুমি এইটি ধারণ কর।' ঠাকুরকে শয়ন করাইবার সময় হাওয়া করিয়া মশারি খাটাইবার ভার আমার উপর দিয়াছিলেন। একদিন আমি ঠাকুরকে হাওয়া করিয়া শয়ন দিয়া মশারি ফেলিয়া খাইতে গিয়াছি, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মশারি ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছ?' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ মহারাজ, ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছি।' তাহার পর হইতে আমাকে আর মশারি ফেলিতে দেন নাই। না দেওয়ার কারণ আমার এই মনে হইয়াছিল যে তিনি যতটা সময় হাওয়া করিতেন আমি সে তুলনায় কম সময় হাওয়া করিয়াছিলাম বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। আর একদিন সকালে ঠাকুরের হালুয়া তৈয়ারি করিতে গিয়াছিলেন। যাইয়া দেখিলেন কড়া অপরিষ্কার। কড়াতে লাটু মহারাজ রাত্রে লঙ্কা ফোড়ন দিয়া ছোলাসিদ্ধ খাইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার মনে বিশেষ কষ্ট হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া লাটু মহারাজকে বাপান্ত করেন। তখন লাটু মহারাজ তাঁহার কাছে আসিয়া বলেন, 'শশী আমি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে চিঠি লিখি, তোর মা-বাপ আর আমার মা-বাপ কি আলাদা?' তখন তাঁহার (শশী মহারাজের) এতদূর কষ্ট হইয়াছিল যে

সাম্যাবস্থা লাভ করিতে কয়েকদিন সময় লাগিয়াছিল। তাহার কারণ আমি বুঝিলাম ঠাকুরের বাল্যভোগের বিলম্ব হওয়ায় সেবাপরাধ হইয়াছে। তিনি দৃষ্টিদোষও মানিতেন। আমাকে বলিয়াছিলেন যাহারা লোভী তাহাদিগকে ঠাকুরের ভোগের জিনিস দেখাইবে না, বিশেষ করিয়া দুই-এক জনের নামও আমাকে বলিয়াছিলেন। রোজ সকালে তিনি ফুল তুলিতে যাইতেন এবং আমাকেও রাত্রি থাকিতে সঙ্গে যাইতে হইত। ফুল তুলিয়া আনিয়া ফুলের সাজি রাখিয়া ঠাকুরের ঘরের কাছে আসিয়া জোড়হস্তে বলিতেন, 'ঠাকুর একটু জমি করিয়া দাও। ফুল গাছ করিয়া তোমার পূজা করি।' একদিন ফুল তুলিয়া আসিয়া দেখিলেন ফুল কম হইয়াছে, তজ্জন্য আমার উপর এত উগ্র ব্যবহার করিলেন যে আমাকে প্রায় মারিতে উঠিলেন। আমি সরিয়া যাওয়াতে তিনি নিজের মুখ নিজেই চড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে মুখ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিল। পরে তাঁহার এত কষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হইল যে ওরূপ কষ্ট আর কখনও দেখি নাই। আর একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, 'তুমি দক্ষিণেশ্বরের বাগান হইতে যুঁইফুল তুলিয়া আনিবে। তাহা দিয়া ঠাকুরের গোড়ে মালা করিয়া দিব।' আমি কয়েকদিন আনিবার পর মালীরা আমাকে ফুল তুলিতে নিষেধ করিল। নিষেধসত্ত্বেও আমি দুই-এক দিন ফুল তুলিয়া আনিলাম এবং তাঁহাকে বলিলাম, 'মালীরা ফুল দিতে নারাজ। তাহারা আমাকে ফুল তুলিতে নিষেধ করে। আমি আর দক্ষিণেশ্বরের বাগানে ফুল তুলিতে যাইব না।' তিনি তখন মহেন্দ্র মাস্টারকে খাজাঞ্চীকে গিয়া বলিতে বলেন যাহাতে ফুল তুলিতে আসিলে যেন কোনরূপ আপত্তি না হয় খাজাঞ্চী মালীদের সেইরূপ অনুমতি করিয়া দেয়। তাঁহার বলা সত্ত্বেও আমি আর কখনও সেখানে যাই নাই। তাহার পর হইতে তিনি নিজেই যাইতেন এবং খাজাঞ্চী

মালীদিগকে বলিয়া দেওয়াতে আমরা নির্বিঘ্নে ফুল তুলিয়া আনিতাম। আর একটি বাগান হইতে আমি রাত্রি থাকিতে ফটক পার হইয়া ফুল তুলিয়া আনিতাম। মালী টের পাওয়াতে আমাকে আর ফুল আনিতে দিত না। তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'উড়ে মালী আর আমাকে ফুল তুলিতে দেয় না।' তাহাতে তিনি বাবুরাম মহারাজকে বলেন, 'ভাই, তুমি কোন রকমে গুড়ের বাগানের মালীকে গিয়া রাজী কর।' বাবুরাম মহারাজ মালীকে একখানা নূতন কাপড় দিয়া রাজী করাইয়া আমাকে বলেন, 'যাও ফুল লইয়া আইস।' আমি কয়েক মাস ফুল আনিবার পর সে মালী দেশে চলিয়া যায়। নূতন মালী আসিয়া আবার ফুল তুলিতে দেয় না। তখন যোগীন-স্বামী ও অন্যান্য সকলে বলিলেন, 'ফুল কিনিয়া পূজা হইবে।' তাহাতে তিনি সম্মত হইলেন না। তখন আবার অন্য বাগান খুঁজিতে হইল এবং এভাবে যাহা পাওয়া যাইত তাহা দ্বারাই তিনি পূজা করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বেটুয়ার মসলা উত্তমরূপে ধুইয়া শুকাইয়া বাছিয়া রাখা হইত। তিনি জোয়ান ধুইয়া একটি একটি করিয়া বাছিয়া রাখিতেন। যাহাতে কাঁকর না থাকে ইহা তিনি বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতেন, এবং আমি যেন তাড়াতাড়ি না করি তাহাও দেখিতেন।

আমি যে ঘরে যেখানে শুইতাম তাহার পাশের দেওয়ালে একটা বড় মাকড়সা ডিম বুকে করিয়া থাকিত। আমি তখন জীবহিংসা করিতে অসম্মত ছিলাম। মাকড়সার ডিম ফুটিয়া বাচ্চায় ক্রমাগত দেওয়াল ভর্তি হইয়া যাইতেছে তাহা আমি দেখিতাম। এমন সময়ে একদিন শরৎ মহারাজ ঘরে আসিয়া সেইটি দেখিয়া আমাকে বলিলেন, 'শশী যদি আসিয়া দেখে তবে তোমাকে মজা দেখাইয়া দিবে।' আমি সে বিষয়ে আর কোন কথাই বলিলাম না। তাহার পর অন্য কেহ আসিয়া আমার অজ্ঞাতে সেসব মারিয়া ফেলে। তাহার দু-এক দিন পরে চৌকাঠ হইতে বিছার ছানা আনিয়া শশী

মহারাজ আমার সামনে মারিতে থাকেন, সঙ্গে শিবানন্দ-স্বামীও ছিলেন। ঠাকুরঘরের পাশেই আমার ঘর ছিল। কাজেই বাচ্চা ক্রমান্বয়ে ঠাকুরের ঘরে যাইয়া তাঁহার অশান্তি উৎপাদন করিবে এইজন্যই শরৎ মহারাজ আমাকে উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে শনিবার ও মঙ্গলবার শশী মহারাজ বাজার হইতে কই মাছ আনিয়া আমাকে কাটিতে বলিতেন আর নিজে বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিতেন আমি কি করি। আমার বিশেষ কষ্ট হইত। তখন তিনি বলিতেন, 'কেমন জীবহিংসা করিবে না?' আমি কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতাম।

আলমবাজার মঠে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিত্য টাটকা গঙ্গাজলে স্নান করাইতেন। ইহা দেখিয়া আমি বলিয়াছিলাম, 'ইহাতে গঙ্গার উপর আমার অবিশ্বাস আসে।' তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'টাটকা জল দ্বারাই স্নান করান চাই। তোমার যদি অসুবিধা হয় আমি স্নান করিবার সময় লইয়া আসিব, তোমাকে আনিতে হইবে না।'

ঠাকুরের ব্যবহারের জিনিস সব একটি টিনের ভাঙ্গা পেটরাতে থাকিত। তাহার ভিতর ইন্দুর ঢুকিয়া বাহ্যে প্রস্রাব করিয়া সমস্ত জিনিষপত্রে দাগ লাগাইয়া দিয়াছিল। একদিন আমার কয়েকটি মার্বেল পাথরের বাটির দরকার হইয়াছিল। কোন বিশেষ দিনেতেই সেগুলি ব্যবহার হইত। আমি তাঁহাকে বলাতে তিনি বলিলেন, 'এই পেটরা হইতে বাহির করিয়া ধুইয়া তাঁহার জন্য তরকারি প্রভৃতি দিও।' আমি পেটরা খুলিয়া দেখি সমস্ত বাটি ও থালাতে দাগ লাগিয়া গিয়াছে। তাঁহাকে বলায় তিনি মহা দুঃখিত হইয়া নিকটবর্তী কোন দোকানে যাইয়া ভাঙ্গা টিন দিয়া বন্ধ করা যাইতে পারে এরূপ একটি বাক্স তৈয়ারি করাইয়া সেইদিনই সমস্ত জিনিস-পত্র তাহাতে পুরিয়া তালাচাবি বন্ধ করিয়া রাখেন।

তাহার দুই-তিন দিন পরে আমাকে বলিলেন, 'তুমি এই সমস্ত

রক্ষার ভার লও।' তাহাতে আমি বলিলাম, 'আমার কোন ঠিকানা নাই, কোথায় থাকি, কোথায় যাই। কাজেই আমি এসমস্ত ভার লইতে পারিব না।' আমি যতদিন তাঁহার সঙ্গে ছিলাম, সেবার কাজ ছাড়িয়া কখনও তাঁহাকে কলিকাতায় রাত্রিবাস করিতে দেখি নাই।

প্রত্যহ ঠাকুরের বাল্যভোগ ও জলখাবার কিনিয়া আনা হইত। আমাকে বলিতেন যে, 'সন্দেশ না চাখিয়া আনিও না কারণ বাসি ছানার সন্দেশ টক হয়। এ বিষয়ে কখনও ভুল না হয়। বাজার হইতে যেসব তরকারি চাল ডাল ইত্যাদি ভাল তাহাই লইয়া আসিবে। তাহাতে মূল্য বেশী দিতে হয় সেও ভাল।' বাছিয়া বাছিয়া ভাল জিনিস কিনিয়া আনাতে আলমবাজারের লোকেরা বলিত, 'এ সাধুদের জ্বালায় বাজারে ভাল জিনিস পাইবার উপায় নাই। পাহাড় জঙ্গল দেশবিদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বোধ হয় ইহারা কোথায় অনেক টাকা পাইয়াছে। তাহা দিয়া সেরা সেরা জিনিস কিনিয়া খায়।'

আমি একবার মাহেশের রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখান হইতে নৌকায় আসিতে অনেক রাত্রি হয়, সেজন্য আমায় এত ভর্ৎসনা করেন যে আমার বিশেষ কষ্ট হয়। ভর্ৎসনার কারণ বুঝিলাম আমি ঠাকুর-সেবার কাজ ফেলিয়া রথ দেখিতে গিয়াছিলাম।

একদিন রাত্রিতে শীতকালে শশী মহারাজের কিছুতেই নিদ্রা হইতেছিল না। তাঁহার অত্যন্ত শীত করিতেছিল। তখন তাঁহার মনে হইল বোধ হয় ঠাকুরের শয়নের সময় তাঁহার গায়ে লেপ দেওয়া হয় নাই, ভুল হইয়াছে। তখনই ঠাকুরঘর খুলিয়া দেখেন, ঠাকুরের গায়ে শীতবস্ত্র দেওয়া হয় নাই। তখন ঠাকুরের গায়ে লেপ দিয়া নিজে শীতমুক্ত হন এবং নিরুদ্বেগে ঘুমাইতে পারেন।

আর একদিন দুপুরবেলা দোতলার বাহিরের বৈঠকখানায় খাওয়া-দাওয়ার পরে মহাভারতের 'মোক্ষপর্বাধ্যায়' পাঠ করিতে ছিলেন। এমন সময়ে সকলে জোরে জোরে কথা কহিতে আরম্ভ

করেন। তাহাতে আমি বলিলাম, 'ঠাকুরের শয়নের সময়ে গোলমাল করা ভাল নহে।' তখন তিনি বলিলেন, 'ঠিক বলিয়াছিস।' সেই দিন হইতে আর ঐ সময়ে ওখানে কাহাকেও গোলমাল করিতে দিতেন না।

মান্দ্রাজ মঠে থাকাকালীন

স্বামীজী দ্বিতীয়বার আমেরিকা হইতে আসিবার সময় আমি মায়াবতী ছিলাম। পরে স্বামীজী মায়াবতী গিয়া ফিরিয়া আসিবার পরে আমার শরীর খারাপ হওয়াতে আমিও পাহাড় হইতে নামিয়া কনখলে আসি। তাহার পর মনে হইল এখন মঠে যাইলে দ্বারকা রামেশ্বর প্রভৃতি দর্শন হইবে না। সুতরাং ঐ সকল তীর্থগুলি দর্শন করিয়া পরে কলিকাতায় গিয়া স্বামীজীর সঙ্গে মিলিত হইব। এই সময় মান্দ্রাজে শ্রীযুত শশী মহারাজের সঙ্গে আমায় পাঁচ-ছয় মাস থাকিতে হয়। কারণ সে সময় রামেশ্বর যাইবার রেলপথটি তৈয়ারি হইতেছিল, চালু হয় নাই। কাজেই গাড়ি না চলা পর্যন্ত আমাকে মান্দ্রাজে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহারমধ্যে যেসকল ভাব আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম এবং তাঁহার সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা যতদূর আমার মনে আছে লিখিতে চেষ্টা করিলাম। ১৯০২ সালের মে অথবা জুনে আমি মান্দ্রাজে পৌঁছাই। এইসময় শশী মহারাজ ঐ প্রদেশেই কোথায় গিয়াছিলেন, আমার যাইবার কয়েকদিন পরেই ফিরিয়া আসেন। বসন্ত (পরমানন্দ) ও আর একটি ব্রহ্মচারী সেই সময় মান্দ্রাজ মঠে ছিল। শশী মহারাজ আমায় জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি দুধ খাও তো?' আমি বলিলাম, 'পাইলে খাই, না পাইলে খাই না।' তখন তিনি আমার জন্য একপোয়া করিয়া নিত্য দুধের ব্যবস্থা করেন। সেখানে গিয়া দেখিলাম কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি যেমন দিবারাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবামাত্র লইয়া তন্ময় হইয়া থাকিতেন এখানে

সেরূপ নহে। এখানে ক্লাসাদি ও পাঠাদিতেই অধিক ব্যস্ত থাকিতেন। তবে কলিকাতার মতো এখানেও বেশী বেশী ফুল দিয়া পূজা করিতে ভালবাসিতেন। তজ্জন্য আমাকে ভোররাত্রে উঠিয়া কোন কোন বাগান হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে হইত। এই সময় স্বয়ং পাক করিয়া পূজাতে ঠাকুরের ভোগ দিতেন। এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়নের পর প্রসাদ পাইয়া ক্লাস করিতে যাইতেন। কখন কখন আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তরকারিও নিজেই কুটিতেন। এই সময় গীতা ও উপনিষদের ক্লাস হইত। ক্লাস করিয়া ফিরিবার সময় ঐ শহরের একটি হালুইকরের দোকান হইতে ক্ষীরের পেঁড়া শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য কিনিয়া আনিতেন; তাহাই ঠাকুরের ভোগ দিতেন—অন্য মিষ্টি দিতেন না। তখন আর অত বাছাবাছি করিতেন না। কিন্তু দৃষ্টিদোষটা পূর্বাপেক্ষা বেশী মানিতেন বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল। যখন ঠাকুরঘরে ভোগ লইয়া যাওয়া হইত, তখন যাহাতে কেহ না দেখিতে পায় সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতেন। এমনকি কাঁচা তরকারি পর্যন্ত কাটিবার সময়ে পাছে অপরে দেখিতে পায় এজন্য দরজা বন্ধ করিয়া দিতেন। একদিন দরজা খুলিয়া তরকারি কাটিতেছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠেন। তাঁহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। রান্নাঘরের দিকে কেহ যাইতেই পারিত না। একদিন আমি স্নানাদি করিয়া ঠাকুরঘরে যাই, ফিরিবার সময় ঠাকুরের দিকে পিছন করিয়া আসিতেছিলাম, তাহা দেখিয়া তিনি এত রাগিয়াছিলেন যে পারেন তো আমায় মারেন আর কি!

মাদ্রাজে তাঁহাকে অর্থাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এক সময়ে তিনি Upanishad Publisher-(উপনিষদ প্রকাশক) দিগকে বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমাদের translation (অনুবাদ)

করিয়া দিতেছি, তোমরা আমাকে কিছু কিছু করিয়া টাকা দিও।' এই কথা শুনিয়া তাঁহারাই মঠের জন্য monthly subscription (মাসিক চাঁদা) এর ব্যবস্থা করিয়া দেন। রামনাদের মহারাজা শশী মহারাজের খরচের জন্য টাকা দিতেন কিন্তু সেই টাকা যাহারা শশী মহারাজকে মান্দ্রাজে লইয়া গিয়াছিল (আলাসিঙ্গা, জি জি প্রভৃতি) তাহারা কিছু অংশ খরচ করিয়া ফেলিত; বাকীটা তাঁহাকে দিত। অর্থাভাবে সময়ে সময়ে ঋণগ্রস্ত হইয়াও তাঁহাকে মঠ চালাইতে হইয়াছিল। মান্দ্রাজ মঠেও তিনি অতি গোপনে মহাষ্টমীর দিন ৺মহামায়ীকে মৎস্যাদি ভোগ দিতেন। সে প্রসাদ আমাদের দিয়াছিলেন, অন্য কাহাকেও দেন নাই।

তাঁহার ভিতর প্রেমের ভাব খুব বেশী ছিল। তিনি ও আমি এক ঘরে এক তক্তাপোষে শুইতাম। পরমানন্দ নীচে শুইতেন। এই দেখিয়া আর একখানি খাট জোগাড় করিয়া আনেন। কিন্তু মশারি একটি ব্যতীত ছিল না। তখন আর একটি মশারি সংগ্রহের চেষ্টা করেন। সমস্ত মাদ্রাজ শহরে কোথাও মশারি পাওয়া গেল না। একটি দোকানে একখানি মাত্র মশারির কাপড় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেলাই করিবার লোক না পাওয়ায় তিনি নিজেই সেলাই করিতে আরম্ভ করেন। আমিও তাঁহাকে ঐকাজে সহায়তা করি।

রামেশ্বর হইতে ফিরিবার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কাছে টাকাকড়ি আছে তো?' আমি বলিলাম, 'যাহা ছিল রামেশ্বর যাইতেই তাহা খরচ হইয়া গিয়াছে।' তখন তিনি বলিলেন, 'কলিকাতা যাইবার ভাড়া তো চাই।' আমি বলিলাম, 'তাহা ভিক্ষা করিয়া যোগাড় করিয়া লইব।' তাহাতে তিনি অসম্মত হন এবং বলেন, 'গাড়িভাড়া আমিই যোগাড় করিয়া দিব।'

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে একদিন রাত্রে শুইয়া আছি। কিছুক্ষণ পরে শশী মহারাজ আমাকে ডাকিলেন, 'দীনবন্ধু দীনবন্ধু'। আমি

বলিলাম, 'কেন মহাশয় ডাকিতেছেন?' তাহাতে তিনি বলিলেন, 'আমি দেখিলাম নরেন (স্বামীজী) আমার সামনে দাঁড়াইয়া আমায় বলিতেছে, 'দেখ শশী, আমি শরীরটাকে থুথু ফেলিবার মতো ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছি।' এই ব্যাপারের আমিও কিছু বুঝিলাম না, তিনিও কিছু বুঝিতে পারিলেন না। সেদিন রাত্রে কিন্তু আর ঘুম হইল না। মনটা আমার খারাপ হইয়া রহিল। পরদিন সন্ধ্যার পর আলসিঙ্গা প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত একটি টেলিগ্রাম লইয়া উপস্থিত হইল। উহা বেলুড় মঠ হইতে গিয়াছিল। উহাতে স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধির সংবাদ ছিল। ঐ সংবাদ পাইয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। শশী মহারাজ আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন, 'এসব তো হইয়াই থাকে।' আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'আপনারা ঠাকুরকে লইয়া অনেকটা ভোগ করিয়াছেন। আমরা তো ইঁহাকে লইয়া ছিলাম। যাক শ্রীশ্রীঠাকুরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।'

ইহারই কিছুদিন পরে পঞ্জিকা দেখিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, 'আগামীকল্য দিন ভাল আছে, তুমি কি কলিকাতায় রওনা হইবে?' আমি বলিলাম, 'যে আজ্ঞা মহাশয়।' তাহার পরদিন ভোরে উঠিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভোগ দিয়া আমার খাইবার জন্য একখানি ঠাঁই করিয়া আমাকে বলিলেন, 'এদিকে এস।' আমি কাছে যাইলে আমার কপালে দই দিয়া একটি ফোঁটা দিলেন। তাহার পর ঠাকুর প্রণাম করিয়া আসিতে বলিলেন। আমি প্রণাম করিয়া আসিলে আমায় প্রসাদ পাইতে বলিলেন। আমি প্রসাদ পাইলাম। তিনি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। দেখিয়া মনে হইল যেন মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতেছেন। আমি তো অবাক্। আমার খাওয়া শেষ হইবার পরে একখানা গাড়ি আনাইলেন। তাহাতে আমি ও তিনি উঠিয়া স্টেশনের দিকে চলিলাম। স্টেশনে গিয়া

ইণ্টারক্লাশের একখানা টিকিট কিনিয়া ট্রেনের কাছে আসিলেন। পরে একখানি কম্পার্টমেণ্টে উঠিয়া নিজের বস্ত্রাঞ্চলে স্থানটি পরিষ্কার করিলেন এবং খাবার যাহা কিছু লইয়া গিয়াছিলেন তাহা সেখানে রাখিয়া আমার বিছানা পাতিয়া দিলেন। টিকিটখানা আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'এস গাড়িতে উঠ।' আমি গাড়িতে উঠিলাম। তিনি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার পরই গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তিনি একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন, ইহা আমি দেখিতে পাইলাম। এরূপ বাৎসল্যভাব একমাত্র স্বামীজীর মধ্যেই দেখিয়াছিলাম।

রামকৃষ্ণানন্দ-প্রসঙ্গ

২

স্বামী শুদ্ধানন্দ

আমি বরাহনগর মঠে, বোধ হয় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আসতে আরম্ভ করি। তখন স্বামী বিবেকানন্দ মঠ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বেরিয়েছেন। তার কিছু পূর্বেই মাস্টার মশাই-এর একটি বয়ঃস্থা বিবাহিতা কন্যার (১৬।১৭ বয়স) দেহত্যাগ হয়েছে। এই বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে শশী মহারাজকে কয়েকবার দর্শন করি। ১৮৯৭ সালের মে মাসে আমি মঠে যোগ দিয়েছিলাম। তখন স্বামীজী তাঁকে মান্দ্রাজে পাঠিয়েছেন।

এই সময়ের পর তিনি মান্দ্রাজ থেকে কয়েকবার মঠে আসেন। সেই সব সময়ে তাঁকে মঠে বা কলিকাতায় দর্শন করার সৌভাগ্য হয়।

তিনি প্রথম আসেন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, স্বামীজী তখন জীবিত। দ্বিতীয়বার আসেন, স্বামীজীর দেহত্যাগের কিছু পরে। তখন ত্রিগুণাতীত-স্বামী আমেরিকায় যাননি। আমার মঠে খুব পেটের অসুখ ও মন্দাগ্নি হওয়ায় কলকাতার বাড়িতে এক সপ্তাহ থাকি। মঠের সকলকে নিমন্ত্রণ করে পাড়ার ভক্তেরা আমাদের বাড়ি খাওয়ায়। হরি মহারাজ, সারদা মহারাজ, লাটু মহারাজ শরৎ মহারাজ প্রভৃতি ছিলেন। মহারাজ আসতে পারেননি। কয়েকদিন বাদে মহারাজকে আর একদিন আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময়ে শশী মহারাজ মঠে এসে পড়েন। তাঁকে যেতে বলা হলেও যাননি। সম্ভবতঃ এটা ১৯০২-এর কোন এক সময়ে।

তৃতীয়বার ১৯০৪ সালের বোধ হয় আধাআধি, তখন পরমানন্দও সঙ্গে এসেছিলেন। পরমানন্দকে উদ্বোধনের worker (কর্মী) করবার চেষ্টা করা হয়।

চতুর্থবার ১৯০৬-এ। মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে অভেদানন্দ-স্বামী ও পরমানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে পুরী থেকে আসেন।

পঞ্চমবার তখন পূর্ণানন্দ সবে মঠে যোগ দেবার উপক্রম করছে। আমার জ্বর। হারাণ রক্ষিতের 'কামিনী ও কাঞ্চন'-এর review (সমালোচনা) লেখা 'উদ্বোধন'-এ বেরিয়েছে।

আমি তখন কোঠারে। শ্রীশ্রীমাও কোঠারে। মাঘ মাস—তখন সবে হরি মহারাজ প্রথমবার দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে বাস করে মঠে এসেছেন।

শুকুল কৃষ্ণলাল সত্যকাম মাকে নিয়ে দাক্ষিণাত্যে গেছেন—বোধ হয় ১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারি। শশী মহারাজ মাকে সমস্ত দক্ষিণ দেশ বেড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

তারপর আমি এপ্রিলে মঠে যাই এবং তারপর জুলাইয়ে কাশী যাই। এই সময়ে এপ্রিল ও জুলাইয়ের মধ্যে শশী মহারাজ থাইসিস হয়ে কলিকাতা উদ্বোধনে নূতন বাড়িতে আসেন। এই সময়েও আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি কাশী গিয়ে রয়েছি সেই সময়ে আগস্ট মাসে তাঁর দেহত্যাগ হয়।

শশী মহারাজ মান্দ্রাজে ১৮৯৭ থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ ১৪ বৎসর ছিলেন। তাঁর নিকট পরমানন্দ এবং ধ্যানানন্দ (রুদ্র মহারাজ) দীর্ঘকাল যাবৎ ছিলেন। উমানন্দও (যোগীন মহারাজ) ছ' বৎসর ছিলেন। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে নির্ভয়ানন্দ (১ বৎসর বোধ হয় গোড়াতে), সচ্চিদানন্দ (বুড়োবাবা) (ছ' মাস), অচলানন্দ (১ বৎসর), গুপ্ত মহারাজ, নির্মলানন্দ, শঙ্করানন্দ, আত্মানন্দ, বোধানন্দ, বিমলানন্দ, সচ্চিদানন্দ, (মতি মহারাজ) শর্বানন্দ, যোগেশ্বরানন্দ, (রামবাবুর শিষ্য সুরেশ), কৃষ্ণলাল, প্রকাশ (শরৎ মহারাজের ভাই) সুরেন্দ্রবিজয়, ব্রজেন প্রভৃতি ছিলেন।

বরাহনগর মঠে শশী মহারাজ আমাকে 'পঞ্চদশী' ও শ্রীমতী স্টোর লেখা 'আঙ্কল টম্‌স্ কেবিন' পড়তে বলেন।

বোধ হয় বরাহনগর মঠে তিথিপূজার দিন রাত্রে ছিলাম। শশী মহারাজ পূজক আর ফকিরবাবু তন্ত্রধারক। অনেকক্ষণ বসে পূজা দেখেছিলাম। ত্রিগুণাতীত-স্বামী ডেকে নিয়ে গিয়ে শোয়ালেন।

তখন দশমহাবিদ্যার পূজা হচ্ছিল। ক্রমাগত নৈবেদ্য বদলান হচ্ছিল আর 'হ স ক ল রীং' প্রভৃতি দেবীর মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল। মহাপুরুষ 'শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারী' গানটি গাইলেন।

পরদিন প্রাতে হোম হল, দেখলাম। সেই সময়ে 'বলভাই হরি ওঁ' রাম নাম কীর্তন হল।

· তাঁর ঠাকুর সেবার খুব নিষ্ঠা দেখেছি। মনে আছে, কথাবার্তা কইছেন, ঘড়ি কাছে আছে, ঘড়ি ধরে সময় দেখে ঠাকুর সেবায় যাবেন।

আরতির সময় 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' বলে খুব উৎসাহের সঙ্গে চিৎকার ও নৃত্য করতেন।

একদিন আলমবাজারে আমায় ঠাকুরের জীবনী লিখতে বলেছিলেন। 'যেমন ম্যাক্সমূলার লিখেছে তার version (বিবরণ), এ তোমার version (বিবরণ) ঠাকুরের life (জীবনী) হবে।'

প্রাণায়াম করার ও জ্যোতিদর্শনের কথায় attack (আক্রমণ) করে বলেছিলেন, 'চোখে সরষে ফুল দেখবে।' থাইসিসের সময় উদ্বোধনে আমায় বলেছিলেন 'ব্রহ্মসূত্র'-এর একটা literal (আক্ষরিক) তর্জমা করতে।

একবার মান্দ্রাজ থেকে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে গাড়ি করে সুরেন ভট্টাচার্যের বাড়ি খালি গায়ে যাই। গাড়ি উদ্বোধন থেকে হাওড়া ঘুরে গিয়েছিল। পৌঁছিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন খোল আছে কিনা। খোল নেই শুনে বললেন, 'যেখানে খোল নেই সে তো শ্মশানপুরী।' অমনি খোল আনতে লোক ছুটল। আশুবাবু (আশুতোষ ভট্টাচার্য) খোল নিয়ে 'ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নামরে' ইত্যাদি কীর্তন করেন। উনি কীর্তনে যোগ দিয়ে ভয়ঙ্কর

নৃত্য ও চিৎকার করেছিলেন। আমি ভয়ে সরে ছিলাম। তারপর ঠাকুরের পূজা করলেন। ওঁকে নতুন কাপড় দিলে পরেছিলেন। শেষে প্রসাদ পাওয়া হল।

একবার পরমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে কলিকাতায় আছেন। পরমানন্দকে তখন 'উদ্বোধন'-এ interested (আকৃষ্ট) করার চেষ্টা করছি। তাকে 'উদ্বোধন'-এ নেবার চেষ্টা করাতে তিনি যেতে দিলেন না। কারণ যেদিন যাবার কথা সেদিন বৃহস্পতিবার বারবেলা ছিল। তখন মার বাড়ি ২ নম্বর বাগবাজার স্ট্রীটে।

আর একবার, বোধ হয় এইবারই বলরামবাবুর বাড়ি মহারাজের পা টেনে নিয়ে সেবা করতে বসলেন। মহারাজের সেবার ত্রুটি হচ্ছে, চাকরবাকরেরা বিছানা সাফ্ করছে না। কয়েকবার চাকরদের দ্বারা করাবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে নিজেই করার উদ্যোগ করলেন।

সংস্কৃত খুব ভাল জানা ছিল। একবার যখন মান্দ্রাজ থেকে আসেন, আমরা যেমন নভেল পড়ি, সেইভাবে সংস্কৃত 'হনুমৎ'-প্রণীত মহানাটক একখানা সঙ্গে করে ট্রেনে পড়তে পড়তে এসেছিলেন।

শাস্ত্রের কথা সব সত্য বলে বিশ্বাস করতেন। প্রক্ষিপ্ত বললে চোটে যেতেন। একবার আমি দু-একটা প্রক্ষিপ্ত undoubtedly point out (নিঃসন্দেহভাবে নির্দেশ) করেছি। তখন চুপ করে রইলেন।

মঠে পান খেতে দেওয়া হয়েছিল, চুনে গাল পুড়ে গেল। 'উদ্বোধন'-এ স্বামীজী সম্বন্ধে কবিতা বার করেছিলাম। আমাদের warn (সতর্ক) করেছিলেন, 'তোমরা যেমন স্বামীজীকে বাড়াচ্ছ দু' হাত তেমনি রামদাদার চেলারা তাঁকে বাড়াবে চার হাত। গোঁড়ামির competition (প্রতিযোগিতা) চলবে।'

'বীরবাণী'র সংস্কৃতগুলো প্রমথনাথ তর্কভূষণকে দিয়ে edit

(সম্পাদনা) করানতে চটে গিয়েছিলেন। বলতেন, 'ওগুলো "আর্যপ্রয়োগ"।'

একবার আমি তন্ত্রধারক, আর একজন পূজক। তিনি উপস্থিত ছিলেন। খুব তাড়াতাড়ি মন্ত্র পড়ে যেতে বললেন, তাই করা হল।

অভেদানন্দ-স্বামী যেবার আসেন, আমি বিনোদের বাড়ি ছুতোর পাড়ায় নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে শ্যামপুকুরে ট্রাম থেকে পড়ে গেছি। মঠে ঘটে দুর্গাপূজা হবে। মহাপুরুষ পূজক, শশী মহারাজ তন্ত্রধারক, 'চিদে বসা, রুজে বসু'। কুমড়ো বলি হবে সন্ধি পূজার সময়ে। কাছে ঘড়ি আছে, বললেন, যখন আমি 'জয় মা' বলব তখন ঠিক সময় হয়েছে জানবে এবং বলি দেবে। তিনি ভয়ঙ্কর চিৎকার করে 'জয় মা' বলেছিলেন।

একদিন মঠে ক্লাস করেছিলেন। আমরা সকলে বসে ছিলাম। দক্ষিণ দিকের ঘরে তখন ভিসিটার্স রুম ছিল, এখন যেখানে শোবার ঘর (কানাই মহারাজের ঘর)। আলোচ্য বিষয় বেশ বিস্তারিতভাবে বুঝিয়েছিলেন।

তাঁরও জ্বর, আমারও জ্বর (তখন পূর্ণানন্দ মঠে সবে ঢুকেছে। আমাদের সেবা করছে)। খাওয়ার সময় চিৎকার করে—'জয় গুরুমহারাজজীকি জয়' হচ্ছে। Remark (মন্তব্য) করলেন, 'শুধু ও রকম 'জয়' দিলে কি হবে ?'

একবার ডাক্তার কাঞ্জিলাল এসেছেন। তিনি ও আমি নৌকা করে মঠে যাচ্ছি। কাঞ্জিলাল নিজের পূর্বকাহিনী, দুর্বলতা ইত্যাদি তাঁকে বলছিলেন। তিনি খুব উৎসাহ দিয়ে উপদেশ দিচ্ছিলেন।

লোকের দরকার মান্দ্রাজ মঠে, লোক মিলছে না। তিনি মঠে এসেছেন। সুরেন্দ্রবিজয় রিপন কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। গ্রীষ্মের ছুটি মঠে কাটাতে, বই-পত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছে। বাবুরাম মহারাজ সাধু হতে চায় মনে করে খুব তাড়া দিয়েছেন। ছেলেটা না খেয়ে বেলতলায় বসে খুব কেঁদেছে। বৈকালবেলা মঠের দিকে

আসতে চোখ ফোলা দেখে সকলে sympathy (সহানুভূতি) করে প্রসাদ খাওয়ালে। শশী মহারাজ নৌকা করে মার দর্শনে যাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে নৌকায় করে কলকাতায় গেল। তার কথা শুনে মহারাজের sympathy (সহানুভূতি) হল। মার কাছে গিয়ে বললেন, 'মা একে সন্ন্যাস দিন।' মা অমনি পাঠিয়ে দিতে বলাতে পাঠিয়ে দিলেন। মান্দ্রাজ ফিরে যাবার আগে এই সব করে গেলেন। আমাদের attack (আক্রমণ) করে বলেছিলেন, 'ভাগ্যিস মা আছেন। তাঁর কৃপায় তবু দু-একটা ছেলে পাওয়া যায়।'

সোমানন্দ পাগল হওয়ার কথায় বলেছিলেন, 'তোমরাই তো পাগল করে দিয়েছ।'

তিনি বাড়ির কারো সঙ্গে দেখা করার বিরোধী ছিলেন। অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল ইদানীং। কিন্তু বাড়ি যাননি। শরৎ মহারাজ বাড়ি যেতেন বলে তাঁর উপর খুব চটতেন।

খবরের কাগজ পড়ার উপর খুব চটা ছিলেন। তখন প্রজ্ঞানানন্দ ও শচীন সবে মঠে ঢুকেছে। তারা খুব খবরের কাগজ পড়ে একথা তাঁকে কে বলাতে খুব চটে গিয়ে গাল দিয়েছিলেন।

মঠে আরতির সময় যোগ দিয়ে মাঝে মাঝে হুঁকার দিয়ে উঠতেন। 'তেজস্তরস্তিস্থরিতং'-এর জায়গায় 'তরসা' বলতেন।

থিয়োসফিস্টদের উপর খুব চটা ছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে কলিকাতায় যে conver-tion of Religions (ধর্ম সম্মেলন) হয়েছিল তাতে যোগেন মিত্র মশাই থিয়সফির representative (প্রতিনিধি) হয়ে ঐ সম্বন্ধে একটা paper (ভাষণ) পড়েছিলেন। তিনি তারপর একবার এসে মঠে remark (মন্তব্য) করেছিলেন, 'তোমরা থিয়সফিকে আবার religion এর (ধর্মের) ভিতর দিলে কেন? ওরাই তো বলে থিয়সফি কোন relagion (ধর্ম) নয়।' রুদ্রের মুখে শুনেছি, মান্দ্রাজে লোকেরা সব আডিয়ার থেকে থিয়সফির বক্তৃতা শুনে ফিরছে, উনি

দরজার কাছে বসে ডেকে ডেকে তাঁদের জিজ্ঞাসা করতেন, 'কি শুনে এলে? যদি থিয়সফি মানে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তবে আর ওদের ওখানে নূতন কি শুনতে যাচ্ছ? আর যদি তা না হয়, নূতন কিছু হয়, তবে তাতে আর আছে কি?'

যখন Sree Krishna the pastoral (রাখাল শ্রীকৃষ্ণ) ও Sree Krishna the King maker (নৃপতিস্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ) তাঁর দুটো লেকচার আলাদা pamphlet from এ (পুস্তিকাকারে) ছাপা হয়, তখন 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর প্রথম প্রেসিডেণ্ট স্বামী স্বরূপানন্দ ওর সম্পাদক। লেখাগুলিতে অনেক আজগুবি ঘটনা বলা হয়েছে বলে তিনি slight Criticism (সামান্য বিরূপ সমালোচনা) করে লিখেছিলেন। শুনেছি নাকি সেই Criticism (সমালোচনা) দেখে চোটে বলেছিলেন, 'স্বরূপ শালা।'

স্বামীজী যখন ওঁকে মান্দ্রাজে পাঠান তখন মান্দ্রাজীদের নাকি বলেছিলেন, 'আমার এমন এক গুরুভাইকে তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি, যাকে তোমাদের খুব পছন্দ হবে। তোমাদের চেয়েও orthodox (নৈষ্ঠিক)।' তিনি নাকি মান্দ্রাজীদের দৃষ্টিদোষ প্রভৃতি সব মেনে চলতেন। তবে রুদ্রের কাছে শুনেছি মাঝে মাঝে মাছ খাবার ভারি ঝোঁক হত। তখন মা-ঠাকরুনকে লিখে অনুমতি আনিয়ে (তাঁর গায়ের ক্ষতের জন্য কলাই ডাল ও মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ওটা এক প্রকার কুষ্ঠ, ওর জন্য শাসপুরের তেল ব্যবহার করতেন। ওর জন্যই তাঁর আমেরিকায় যাবার কথা উঠিলেও যাওয়া হয়নি।) কয়েকদিন রেঁধে খুব করে মাছ কতকগুলো খেয়ে তাতে বিরক্তি আনতেন। বামুনকে হয়ত কোন কাজে পাঠান হত, নিজে রাঁধতে যেতেন। সেই সময় রামু হয়ত এসে উপস্থিত এবং স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে রান্নাঘরে ছুটেছে। তখন পাছে রামু টের পায় তাকে ভাগাবার জন্য রাগের ভান করে চিৎকার আরম্ভ করতেন। অন্যে

রামুকে বলত, 'আজ স্বামীজী চটেছেন। আজ এস, কাল দেখা হবে।'

স্বামীজী মাছমাংস খেতেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে equivocally (দ্ব্যর্থক) উত্তর দিতেন, 'Swamiji never enjoyed flesh' (স্বামীজী কখন মাংসাহার পছন্দ করেননি)

উৎসবের সময়ে যেসব জিনিস সংগ্রহ হত তার অনেক হয়ত উদ্বৃত্ত হল, তিনি তা নিত্য ঠাকুরসেবায় লাগাতেন। তাতে কিছু moral scruple (নীতিগত দ্বিধা) বোধ করতেন না।

আমাকে প্রথম প্রথম মাদ্রাজ দেখে আসবার কথা বলতেন। বলতেন, 'ভাড়া দেব।' আমার যাবার তখন সুবিধা হয়নি। শেষেও একবার যেতে বলেন। কিন্তু বলেন, 'এরাই (ইঙ্গিত করলেন মঠ থেকে) ভাড়া দেবে।'

গোড়া থেকে 'রামানুজচরিত' লিখে আমার আমলেও regularly (নিয়মিত) 'উদ্বোধন'-এ চালাতে থাকেন এবং আমার আমলেই শেষ হয়। আর একটা chapter (অধ্যায়) আরম্ভ করেন— 'উপদেশ স্তোত্ররত্নমালা' কি ঐরকম একটা কিছু। কয়েকটি শ্লোক অনুবাদ করে chapter-টা (অধ্যায়) complete (শেষ) করেননি বলে ওটা আর ছাপাইনি। তাগাদা দেওয়াতে লিখবেন বলেছিলেন, কিন্তু আর ঘটে ওঠেনি। 'রামানুজচরিত' যখন পুস্তকাকারে উদ্বোধন থেকে ছাপা হয় তখন আমি লিখেছিলাম, 'এ বই-এর আপনি copy right (স্বত্ব) রাখবেন কিনা বা মাদ্রাজ মঠকে কিছু দিতে হবে কিনা?' উনি জবাবে লিখেছিলেন, পরে ভেবে লিখবেন, কিন্তু আর কিছু লেখেননি। গোড়ার দিকে যেখানে আলোয়ারদের বর্ণনা আছে সেখানে কোন আলোয়ারকে বিষ্ণুর শঙ্খের অবতার বলেছে। তিনি সেটা যথাযথ লিখে পরে remark (মন্তব্য) স্বরূপ লিখেছিলেন, 'আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকগণ শঙ্খের অবতার শুনিয়া দ্বাত্রিংশৎপাটী বদন আবিষ্কার করিয়া হাস্য করিবেন।'

আমি এখানকার ভাষা একটু বদলিয়ে দিয়েছিলাম। স্বামীজীর লেখা 'শিবস্তোত্রম্' এখন যেটা 'বীরবানী'তে বেরিয়েছে সেটা 'উদ্বোধন'-এ ছাপার আগে শশী মহারাজকে edit (সম্পাদনা) করতে মান্দ্রাজে পাঠিয়েছিলাম। তিনি edit (সম্পদনা) করে পাঠান। বোধ হয় মূলটি ঐখানে রেখেছিলেন। শেষের দিকটা স্বামীজীর ছিল 'প্রাণপ্রচ্ছেদপ্রীতং', উনি করেছিলেন 'প্রাণবিচ্ছেদস্পৃৎকং'। অনুবাদ উনিই করে দিয়েছিলেন। 'চিকাগো বক্তৃতা'র বঙ্গানুবাদ ওঁরই করা।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্বাভাস' নামক একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠান। তখন দক্ষিণেশ্বরে মাঘী পূর্ণিমায় কয়েক বছর ধরে রামদয়াল চক্রবর্তী প্রভৃতির উদ্যোগে ঠাকুরের একটি উৎসব হচ্ছিল। সেই উৎসবে পঞ্চবটীমূলে সেটি পঠিত হয়। পরে সেটি 'উদ্বোধন'-এ ছাপাই।

তা ছাড়া 'উদ্বোধন'-এ 'দাক্ষিণাত্যে দেবমন্দির' নামক একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন।

এখন যে মন্ত্র পড়ে মঠে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা দেওয়া হয় তা শশী মহারাজের রচনা। শুনেছি তিনি অনেক গৃহস্থকেও এই মন্ত্র পড়িয়ে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করতেন। সেইজন্য দ্বাদশ মন্ত্র যাতে বিবাহ না করার কথা আছে তাতে 'গৃহস্থানাং পক্ষে' এই বিধি বলে অন্য মন্ত্র আছে। অর্থাৎ পরস্ত্রীতে মাতৃবুদ্ধি করতে হবে। আমি পরে ওর ভিতর একটু আধটু addition alteration (অদলবদল) করেছি। শুনেছি শর্বানন্দ শশী মহারাজের নিকট মান্দ্রাজে ঐ মতেই ব্রহ্মচর্য নিয়েছিল। তাঁকে তেজনারায়ণ নাম মহারাজই দিয়েছিলেন। পরে ওর কপি মঠে আনিয়ে মহারাজ প্রথম বিশ্বরঞ্জন ও রুদ্রকে বিধিপূর্বক ব্রহ্মচর্য দেন। দ্বিতীয়বার ১৯১২ সালে কনখলে মহারাজ জীবন, লক্ষ্মণ ও রমেশকে ঐ পদ্ধতি অনুসারে ব্রহ্মচর্য দেন। আমি মন্ত্র পড়ি। জীবন বিবাহিত ছিল। শশী

মহারাজের দুই ধরণের মন্ত্রই তার case-এ (ক্ষেত্রে) applied (প্রযোজ্য) হয় না বলে আমি 'পুত্রদারাদীন্ পরিত্যজ্য' ইত্যাদি মন্ত্র রচনা করি এবং নারায়ণ জ্ঞানে রোগীশুশ্রূষা যে ব্রহ্মচারীর অন্যতম কর্তব্য সে কথা এই পদ্ধতিতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ না থাকায় আমি 'রোগার্তান্ ঔষধপথ্যাদিদানেন শুশ্রূষয়া' ইত্যাদি অংশও যোগ করি।

পাঁজিতে দুর্গাপূজার সময় লেখা থাকে—অমুক সময়ে 'পূজা সমাপ্যা'। আমরা ঠিক পাঁজির মতে পূজা করবার জন্য একবার রাত্রি তিনটা থেকে উঠে পূজার যোগাড় করে ঠিক পাঁজির মতে ৮½/৯টার ভিতর পূজা শেষ করি। বোধ হয় ওর মধ্যে একটা খিচুড়ি ভোগও দেওয়া হয়েছিল। অত সকাল সকাল পূজা শেষ করা কিন্তু মঠের সকলের মনঃপূত হয়নি। এই নিয়ে তর্ক চলতে থাকে। পরে একবার শশী মহারাজ মঠে আসলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন, পাঁজিতে যে সময়ে 'পূজা সমাপ্যা' লেখা আছে, সেই সময়ে আরম্ভ করলেই হল।

শুনেছি মান্দ্রাজে যে সব ব্রহ্মচারী যেত তিনি তাদের উলঙ্গ করে তাদের শরীর পরীক্ষা করে দেখতেন। শরীরের কোন ত্রুটি তাঁর চোখে পড়লে তাকে দিয়ে ঠাকুরসেবার কার্য করাতেন না।

একবার শশী মহারাজ মান্দ্রাজ থেকে টেলিগ্রাম মনি অর্ডার পাঠান—একটি রসুইবামুন ও দু'জন কর্মী পাঠাবার জন্য। টাকা অনেক দিন পড়ে থাকে। সেই সময়ে বিশ্বরঞ্জন ও প্রকাশকে পাঠাবার কথা হয়। শেষে অনেক পরে প্রকাশ যায়। সে এক বছর ছিল। বোধ হয় এই সময়ে প্রভাকর ব্রাহ্মণের ভাগ্নে অভিরামকে পাচক ব্রাহ্মণ করে পাঠান হয়। সেও বছরখানেক ছিল।

রুদ্রকে মান্দ্রাজ পাঠাবার পূর্বে যোগীন (উমানন্দ) মহারাজের নিকট সন্ন্যাস নিতে মঠে এসেছিল। সে প্রায় ছ' বছর শশী মহারাজের কাছে ছিল। তারা জাতিতে তেলী। কিন্তু বাড়িতে তাদের

ময়রার কাজ ছিল বলে সকলে তাকে জাতিতে ময়রা বলে জানত। সে নানারকম খাবার তৈরি করতে জানত। শশী মহারাজ তাকে দিয়ে নানান খাবার তৈরি করিয়ে ঠাকুরকে ভোগ দিতেন। তিনি তাকে মহারাজের নিকট সন্ন্যাস নিতে পাঠিয়েছিলেন। মহারাজকে আগে না জিজ্ঞাসা করেই পাঠিয়েছিলেন। তার সন্ন্যাস নিয়ে পশ্চিমে কাশী প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন বেড়াবার ও তপস্যা করবারও ইচ্ছা ছিল। সেইজন্য তাকে পাঠাবার পর শশী মহারাজ একটি ব্রহ্মচারী তাঁর সাহায্যের জন্য মঠ থেকে পাঠাবার জন্য বার বার লিখতে থাকেন। এতে মহারাজ বিরক্ত হয়ে আমাকে দিয়ে লেখান —'আমাকে আগে না জানিয়ে যোগীনকে পাঠালে কেন?' তাতে শশী মহারাজ অভিমান করে কিছুদিন মহারাজকে কোন পত্রাদি লেখেননি। রামু শেষে লিখল, 'একলা স্বামী খুব খাটছেন। তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে' ইত্যাদি। এদিকে রুদ্র অল্পদিন হল মঠে যোগ দিয়েছে। তখন মঠে আমরা নিজেরা উপনিষদাদি শাস্ত্র পড়ি। সকলে মিলে মঠে শশী মহারাজের খুব সমালোচনা চলছে– তাঁর ওখানে নূতন ব্রহ্মচারীর কোন training (শিক্ষা) হয় না। তিনি অনর্থক ব্রহ্মচারীদের অতি কুৎসিত ভাষায় গালাগলি দেন। ঠাকুরের ভোগ দেওয়া জিনিস রুটি প্রভৃতি বাসি রেখে সেগুলো প্রসাদ বলে তাদের খাওয়ান। তাতে তাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয় ইত্যাদি। যোগীন কাউকে পাঠাবার গা না দেখে মাঝে মাঝে নার্ভাস হয়ে বলে, 'কাউকে না পাঠান তো বলুন, আমি আবার ফিরে যাই।' শেষে প্রায় তিন মাস মঠে থাকার পর রুদ্রকে পাঠান হয়।

একবার শুনেছি মান্দ্রাজ মঠে মহারাজ শশী মহারাজকে criticise (সমালোচনা) করছিলেন। কৃষ্ণলাল মহারাজ তাতে যোগ দিয়ে শশী মহারাজের নিন্দা করতে থাকেন। তাতে মহারাজ কৃষ্ণলাল মহারাজকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি শশীকে ধমকাচ্ছি বলে কেষ্টলালও ঐরকম বলবে কেন? ওর মতো সাধু কটা হয়?'

শুনেছি যখন বরানগর মঠ প্রথম হয়, তখন স্বামীজীর কথায় শশী মহারাজ ঠাকুরপূজার ভার নেন। তিনি কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মে পূজা-সেবার ব্যবস্থা করেন। তাঁর নিয়মে বিভিন্ন সময়ে ঠাকুরকে সর্বশুদ্ধ চোদ্দটি পান ভোগ দিতে হত। বোধ হয় মঠের অন্য সকলের চোদ্দটি পান সাজতে অসুবিধা হত বলেই হোক বা যে কারণেই হোক তাঁর সঙ্গে অপরের তর্কবিতর্ক হয়। স্বামীজীও শশী মহারাজের বিরুদ্ধে তর্কে যোগ দিয়েছিলেন এবং চোদ্দটি পানের পরিবর্তে দশটি বারটিতে কেন হবে না এরকম তর্ক করেছিলেন।

এই অবস্থায় শশী মহারাজ উত্তেজিত হয়ে 'fourteen fourteen (চৌদ্দটা চৌদ্দটা)' বলে চিৎকার করতে করতে রাগ করে মঠ থেকে বেরিয়ে যান। অবশ্য তার কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আসেন।

শুনেছি বরানগরে প্রথম অবস্থায় সুরেশবাবু যখন খরচ দিতেন, তিনি তা regularly (নিয়মিত) না দেওয়ায় এবং এঁরা না নিতে যাওয়ায় খুব অনটন হয়। তখন স্বামজী বলেন, 'আমরা সংসার ত্যাগ করেছি, আবার মঠ করে কোন শালার খোশামোদ করব?' বলরামবাবুর বাড়িতে বইপত্র সব পাঠিয়ে দিয়ে সকলকেই এদিক ওদিকে যেতে বলেন। এই সময়ে শশী মহরাজ কেবল বলেছিলেন, 'আমি মহিম চক্রবর্তীর রামকৃষ্ণ ফ্রী-স্কুলে পড়িয়ে সেই টাকায় ঠাকুরসেবা চালাব। শুনেছি স্বামীজী তাঁকে মাদ্রাজে পাঠাবার পূর্বে তিনি মঠ ছেড়ে কোথাও যাননি। কেবল একবার মাত্র নাকি কয়েকদিনের জন্য গাজীপুরে গিয়েছিলেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই জ্বর নিয়ে ফিরে আসেন। এমন কি কাশী বৃন্দাবন কোথাও যাননি। মাদ্রাজ অঞ্চলে অনেক বেড়িয়েছিলেন লেকচার দেবার জন্য, নূতন centre (কেন্দ্র) খোলবার চেষ্টায় এবং শ্রীশ্রীমা ও মহারাজকে রামেশ্বরাদি দেখাবার উদ্দেশ্যে।

মহারাজ মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান দর্শন করে এসে বললেন, 'দেখলুম শশী একটু বেড়ায় না। দিনরাত একটা চেয়ারে বসে শরীরকে

মোটা ও খারাপ করে ফেলছে।' প্রথমে তাঁর বহুমূত্র তারপর যক্ষা হয়।

যখন থাইসিসে ভুগছেন উদ্বোধনে তখন একদিন কি কারণে বাবুরাম মহারাজকে খুব গালাগালি দেন। তারপর যখন হুঁস হল কি করে ফেলেছেন, তখন বাবুরাম মহারাজকে ডেকে বললেন. 'আমাকে কঁ্যাত কঁ্যাত করে লাথি মার।' শেষে যতক্ষণ না বাবুরাম মহরাজ গায়ে পা ঠেকালেন কিছুতেই শান্ত হলেন না। করুণানন্দকে তাঁর সেবা করতে বলা হল, সে করল না, অন্যস্থানে গেল। বিশ্বরঞ্জন প্রভৃতি যোগেন ঠাকুরের ছেলেরা সেবা করলে।

শশী মহরাজের বাবা ঈশ্বর ভট্টাচার্যকে বাড়িতে থাকতে প্রথম দেখি। তিনি জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের শিষ্য এবং পূর্ণাভিষিক্ত ছিলেন। তিনি ইন্দ্রনারায়ণের পুরোহিত ছিলেন। আমাদের পাড়ায় একটি অন্ধকে সঙ্গে করে সাহায্যের জন্য ইন্দ্রনারায়ণের পার্ক-স্ট্রীটের বাড়িতে কয়েকবার নিয়ে যাই। তার মধ্যে একবার ঈশ্বর ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তখন শশী মহারাজকে জানি, কিন্তু ইনি যে শশী মহারাজের বাবা তা জানতুম না। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে ইন্দ্রনারায়ণের কথা জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, 'কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত সাধনা হয়েছিল, তাঁর এখনও ঘুম ভাঙ্গেনি।' তারপর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে প্রায় বেলা ১২টার সময় নিরাশ হয়ে ফিরে যাবার সময় ঈশ্বর ভট্টাচার্যকে খোঁজাতে দেখলাম তিনি ঠাকুরঘরে পূজায় বসেছেন। সেখানে কতকগুলি গেরুয়াপরা সাধু দেখেছিলাম। তাঁরা বেলা দেখে আমায় খেতে বলেছিলেন, চলে এলাম।

তারপর মঠে স্বামীজী থাকতে এঁকে অনেকবার দেখি। মাঝে মাঝে এসে কিছুদিন ধরে থাকতেন। প্রত্যহ ২ রূপ চণ্ডী পড়তেন। তান্ত্রিক ক্রিয়ান্যাসাদি এত অভ্যাস ছিল যে রাত্রিতে ঘুমাতে ঘুমাতে 'অং কং খং' আদি আওড়াতেন। পাশের লোকের ঘুমের ব্যাঘাত

হত। একবার সমগ্র চণ্ডীর হোম সাকল্য দিয়ে করেছিলেন। আমরাও 'স্বাহা' 'স্বাহা' করে (সন্ধ্যার পর উঠানে) অগ্নিতে সাকল্য দিয়েছিলাম। আমরা পূজার জন্য মুদ্রাদি শিখছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এক তত্ত্বমুদ্রা দেখালেই সব মুদ্রা সিদ্ধ হয়।' একদিন 'দুর্গাপূজার সময়ে (ঘটে) আমাদের একখানি মাত্র বস্ত্র ছিল। তা সপ্তমীর দিন নিবেদন করে দেওয়াতে মহাষ্টমীর দিন 'বস্ত্রার্থে গঙ্গোদকম্' মন্ত্র পড়াচ্ছিলাম। তাঁকে আমাদের পূজার সময় থেকে ঠিক ঠিক হয় কিনা দেখতে বলা হয়েছিল। ভট্টাচার্য মশায় ঐ কথা শুনে চটে গিয়ে বলেছিলেন, 'দেবী কি এক কোমর জলে গিয়ে দাঁড়াবেন নাকি? ঐ নিবেদিত বস্ত্রখানিই চেয়ে নিয়ে নিবেদন করে দাও।' স্বামীজী যে প্রতিমা করে ১৯০১ সালের অক্টোবরে মঠে দুর্গোৎসব করেন, তাতে ইনিই তন্ত্রধারক ছিলেন এবং তার পরের ৺কালীপূজায় কারণ খেয়ে পড়ে গেছলেন শুনেছি। স্বামীজীর দেহত্যাগের দিন মঠে আসেন। স্বামীজী তাঁকে দেখে খুসী হয়ে বলেন, 'এই যে ভট্‌চাযি্য মশায় এসেছেন। ভালই হল। কাল পঞ্চোপচারে ৺কালীপূজা করবার ইচ্ছা আছে।'

শুনেছি ঠাকুরের নিকট যখন শশীমহারাজ যাচ্ছেন, তখন একবার তাঁর বাবা জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকে নিয়ে ঠাকুরের কাছে গিয়ে ওকে ফিরিয়ে আনতে গিছলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি ঠাকুরের নাকি কি নিন্দা করেন। শশী মহারাজ অমনি 'কঃ পিতা' বলে তাঁকে কাটতে গিয়েছিলেন। তাতে ভট্টাচার্যমশাই খুব খুশী হয়ে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ তোরই ঠিক ঠিক গুরুভক্তি।'

একবার বোধ হয় আলমবাজার মঠে, বাড়ি থেকে এসে রাত্রে আছি। রামবাবু (দত্ত) সম্বন্ধে কথা উঠেছে। যতটা মনে হয় নিত্যানন্দ-স্বামী এবং যোগীন চাটুয্যে রামবাবুর খুব নিন্দা করছিল, শশী মহারাজ ধমক দিয়ে বললেন, 'রামবাবু কতবড় বিশ্বাসী ভক্ত জান? আমরা পরস্পর ঝগড়া করি সে আলাদা কথা।

ভায়ে ভায়ে ওরকম ঝগড়া হয়। তা বলে নিন্দা করবে কেন? জান না, পাণ্ডবেরা বলেছিল, "আমরা কৌরবের সঙ্গে বিবাদ করি বটে, কিন্তু এখন আমরা একশ পাঁচ ভাই।" তুমি (আমাকে লক্ষ্য করে) বরং একদিন কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান দেখে এস।'

বরানগর মঠে ভবনাথবাবু এসেছেন। তিনি দুঃখ করছেন: 'তোমরা কেমন সব ত্যাগ করে ভগবানকে ডাকছ আর আমরা সংসারে হাবুডুবু খাচ্ছি।' ভবনাথ এই সময়ে একটি গান গেয়েছিলেন মনে আছে:

'কেন অমিয় ভ্রমে গরল কর পান।
কেন আপাত সুখেতে মজি ভুল পরিণাম।
ভেবেছ কি সার তবে, চিরদিন এইভাবে যাবে?' ইত্যাদি।

শশী মহারাজ তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দিলেন: 'গৃহস্থ কতকগুলি মাছ এনে কতক জিইয়ে রেখে দিয়েছে এবং কতক খোলায় চাপিয়ে ভাজছে। আমাদের এখন তিনি ভাজছেন। তোমাদের জিইয়ে রেখে দিয়েছেন। আবার সময় হলে তোমাদেরও খোলায় চাপাবেন।'

রামকৃষ্ণানন্দ-প্রসঙ্গ

৩

স্বামী অচলানন্দ

১৯০৪ সালের জুলাই মাসে শ্রীশ্রীমহারাজের আদেশানুসারে পূজনীয় শশী মহারাজের সহিত মান্দ্রাজে যাই। সেই সঙ্গে বিমলানন্দ-স্বামী বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য ওয়ালটিয়ারে যান। আমরা তিনজনেই ওয়ালটিয়ারে নামিলাম। সেখানে আমরা কপুপম-এর রাজার অতিথি হই। রাজা শশী মহারাজকে গুরুতুল্য মান্য করিতেন। স্বামী বিমলানন্দকে সেখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সেখান হইতে সাত দিন পরে স্বামীজীর শিষ্য হরিপদ মিত্রের নিমন্ত্রণে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত শোলাপুরে যাওয়া হয়। সেখানকার গণ্যমান্য লোকেরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। সেখানে প্রায় তিন সপ্তাহ ছিলেন। কয়েকটি বক্তৃতা হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা ছিল খুব অদ্ভুত। ঠাকুর-স্বামীজীর কথা ও শাস্ত্রাদির শ্লোক আবৃত্তি করিয়া এক-দেড় ঘণ্টা কাল অনর্গল ইংরেজীতে বক্তৃতা করিয়া যাইতেন। লোকেরা খুব প্রশংসা করিয়াছিল। হরিপদ মিত্রও আমাদের আদর-আপ্যায়ন ও বিশেষ যত্ন-সহকারে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সেখান হইতে আমরা সোজা মান্দ্রাজ চলিয়া আসি। তখন মঠ ছিল সমুদ্র পারে 'আইস হাউস'-এ বিলিগিরি আয়েঙ্গারের বাড়ি। সেখানে স্বামী আত্মানন্দ ও ব্রহ্মচারী যোগীন (পরে উমানন্দ-স্বামী নামে পরিচিত) ছিলেন। শশী মহারাজ ১৯০৪ সালের শেষা-শেষিতে রেঙ্গুন যান। একাই গিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে তিনিই প্রথম রেঙ্গুনে যান ও সেখানে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ওখান হইতে একমাসের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বোম্বাই রওনা হন। ধর্মপ্রচারক-

রূপে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনিই প্রথমে বোম্বাই যান এবং সেখানেও খুব বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বোম্বাই যাওয়া ১৯০৫ সালের প্রথমেই হইয়া থাকিবে। ঐ সালের প্রথমেই মান্দ্রাজে 'স্টুডেন্টস্ হোম' ছোটখাট বাড়ি ভাড়া করিয়া রামুর সহিত খোলেন এবং ঐ সময়ে রাজমহেন্দ্রীতে নিমন্ত্রিত হইয়া যান এবং সেখানে বক্তৃতাদি দান করেন। ঐ সালের এপ্রিল-মে-তে ত্রিচিনাপল্লী, শ্রীরঙ্গম, পাতুকোট্টা প্রভৃতি রাজ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া যান। ত্রিচিনাপল্লীতে তাঁহার অভ্যর্থনা এক বিরাট ব্যাপার, বহু লোকসমাগম হইয়াছিল। ঘোড়া খুলিয়া তাঁহার গাড়ি লোকেরা টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। ঐখান হইতে তিন-চার মাইল দূরে শ্রীরঙ্গমের প্রকাণ্ড মন্দিরের ভিতরে কোন ধনীলোকের বাড়িতে আমাদের বাসস্থান ঠিক করা হয়। মন্দিরটি কি বিরাট! উহার ভিতরেই বাজার, পুলিস স্টেশন, পোস্ট অফিস এবং বাড়ি-ঘর রহিয়াছে। সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া ত্রিচিনাপল্লীতে উচ্চ টিলাস্থিত এক দেবালয়ের (Rock Fort Temple) প্রাঙ্গণে বহুলোকের সম্মুখে তাঁহার এক বক্তৃতা হয়। পরে পাতুকোট্টা দেশীয় রাজ্যে যাওয়া হয়। সেখানে কয়েকটি বক্তৃতা ও আলোচনা ক্লাস করেন। কয়েকদিন থাকিয়া তিনি মান্দ্রাজে ফরিয়া আসেন এবং আমিও রামেশ্বর তীর্থদর্শনে যাত্রা করি। যখন মান্দ্রাজে থাকিতেন, কোন না কোন পাড়ায় প্রায় নিত্যই দুই-একটি ক্লাস করিতেন। আমি যতদিন তাঁহাকে দেখিয়াছি কখনও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখি নাই। ঠাকুরের কোননা কোন কাজেতে সর্বদাই নিজেকে নিযুক্ত রাখিতেন। ঐ সময়েতে 'রামানুজচরিত' লেখেন। তামিল অক্ষরে লিখিত কোন সংস্কৃত 'রামানুজচরিত' জনৈক ভদ্রলোক তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতেন। তিনি উহা বাংলায় লিখিয়া যাইতেন। মঠটিকে তিনি ঠাকুরের মনে করিতেন। মঠের যাহা কিছু জিনিসপত্র এমন কি তালাচাবি প্রভৃতি সবই ঠাকুরের। নিজেকে তাঁহার সেবক ও দাস এই জ্ঞানে মঠে

অবস্থান করিয়া তাঁহার সেবায় সর্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। যখন যেমন আবশ্যক পড়িত সব রকম কাজ করিবার শক্তি তাঁহার ছিল। সামান্য তরকারি কোটা রান্নাবান্না প্রভৃতি হইতে বড় বড় আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব আলোচনা প্রভৃতি কার্য বা বক্তৃতা প্রদান সবই প্রভুর সেবা হইতেছে এইভাবে চালিত হইয়া সম্পাদন করিতেন। ধ্যান-ধারণার প্রতি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতে বা তাঁহাকে উহাতে বিশেষভাবে অনুরক্ত হইতে দেখি নাই। সেবাই তাঁহার প্রধান ভাব ছিল এবং উহাই বিশেষ করিয়া শিক্ষা দিতেন। সর্ব অবস্থায় ও সমস্ত কার্যে প্রভুর সেবা হইতেছে এই ভাবই তাঁহার নিকট বিশেষভাবে শিক্ষা পাইয়াছি। ঠাকুরের বাক্যকে তিনি 'বেদ' অপেক্ষাও বড় মনে করিতেন। ঠাকুরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ বা নিষেধগুলি যেরূপ শ্রদ্ধার চেক্ষে দেখিতেন ও পালন করিতেন, ঠাকুরের বড় বড় উপদেশগুলিকেও সেইরূপ ভাবেই করিয়া থাকিতেন। ঠাকুরঘরেতে যে ঠাকুর সত্যসত্যই আছেন, তিনিই মঠ পরিচালনা করিতেছেন, আমরা তাঁহার সেবক মাত্র, এইভাবেই ভরপুর থাকিতেন এবং আমাদের তাহাই শিক্ষা দিতেন। ঠাকুরের কোন সামান্য জিনিস নষ্ট হইলে আমাদের বিশেষভাবে ভর্ৎসনা করিতেন এবং দৈবাৎ কখনও নিজের দ্বারা সামান্য ত্রুটি হইয়া পড়িলে নিজের উপরও বিরক্ত হইতেন এবং গালাগালি করিতেন। যখন মাদ্রাজ মঠে অবস্থান করিতেন তখন তিনি স্বয়ং পূজা করিতেন। তাঁহার পূজাতে একটি বিশেষত্ব ছিল— তিনি যে ঠাকুরঘরে গিয়া খুব ধ্যানধারণা বা মন্ত্রপাঠ করিতেন তাহা নয়। ঠাকুর যেন সত্যসত্যই বসিয়া আছেন, যেন তাঁহার স্নানাদি করিবার সময় হইয়াছে, সেই সময় তাঁহাকে যাইতে হইবে এইরূপে ভাবে গরগর হইয়া ঠাকুরঘরে ঢুকিতেন। ঠাকুরকে স্নান করান, চন্দন ও তুলসী দিয়া সাজান, নিবেদনাদি করা প্রভৃতি চট্‌পট্‌ করিয়া, পূজা সাঙ্গ করিতেন। ভাবে গরগর হওয়ায় মুখ, বুক সমস্ত লাল হইয়া উঠিত এবং 'জয় গুরু' 'জয় গুরু' উচ্চারণ করিতে করিতে বাহির

হইয়া আসিতেন। সেই সময়কার ভাব ও চেহারা বর্ণনা করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। ঠাকুরের প্রসাদ কখনও ফেলিতেন না বা যাহাকে তাহাকে দিতেন না বরং বাসি করিয়া রাখিয়া দিতেন। অন্য ভক্ত না খাইলে নিজে খাইতেন ও বলিতেন, 'যজ্ঞের হবি কুকুরকে দেওয়া যেতে পারে না।' পান্তাভাত বাসিরুটি খাইয়া খাইয়া শরীর খারাপ হইত, তাহা সত্ত্বেও কখন ফেলিতেন না। আমার মনে হয় তাঁহার শরীর পরে যে একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় ইহাই তাহার অন্যতম কারণ। এমন কি তিনি তাঁহার লেক্‌চার দেওয়া, ক্লাস করা প্রভৃতি সমস্তই ঠাকুরের কাজ করিতেছেন বা সেবা করিতেছেন এইভাবে ভাবিত হইয়া করিয়া যাইতেন। আমার মনে আছে একদিন রাত্রে ক্লাস হইতেছে, যতদূর মনে পড়িতেছে 'পঞ্চদশী' ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। তিনি সবরকমের ব্যাখ্যা দিয়া তাহাতে ঠাকুর-স্বামীজীর কথা বলিয়া যাইতেছিলেন। একঘর লোক কিন্তু বেশীর ভাগ ঝিমাইতেছিল। সামনের গুটিকতক লোক মাত্র বসিয়া মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল। ক্লাস হইয়া গেলে আমি তাঁহাকে বলিলাম 'মহারাজ, বেশীর ভাগ শ্রোতা ঝিমুচ্ছিল। আপনি এত করে ঘণ্টাখানেক বলে গেলেন, সামান্য লোকই শুনল।' তিনি এমন ভাবের সহিত উহার উত্তর দিলেন, 'কে কি শুনলে, কি বুঝলে আমি জানতে চাই না। আমি যে তাঁর কথা বলে কৃতার্থ হলাম এই যথেষ্ট।' লেক্‌চার আদি ঐ ভাবেই নিজের উপকার বা কৃতার্থবোধ জ্ঞানে করিয়া যাইতেন। আশ্রমে কোন জিনিস বা আহার্য সামগ্রীর দরকার হইলে তিনি অসঙ্কোচে ক্লাসের ভক্তদের বা ছাত্রদের নিকট হইতে তাহা চাহিয়া লইতেন। চাহিতে কোন দ্বিধাবোধ করিতেন না বা কোনরূপ obligation (বাধিত) বোধও করিতেন না। এমন কি দেখা গিয়াছে যদি কেহ তাঁহার নির্দেশ সত্ত্বেও আনিতে ভুলিয়া যাইত তাহাকে বারবার স্মরণ করাইয়া দিতেন। তিনি বলতেন, 'যে যা-কিছু দিচ্ছে, প্রভুর সেবার জন্যই দিচ্ছে। তাতে তারই কল্যাণ হবে।

এতে আমার কোন স্বার্থ নেই।'

বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি তাঁহার ভিতরে যে পূর্ণভাব তাহাই যেন তাঁহার বাহিরে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। তাঁহার ভিতর-বাহির এক ছিল। সেবাভাবে সর্বদা এত গরগর মাতোয়ারা থাকিতেন যে আমি তাহা মুখে বর্ণনা করিতে পারিব না। একদিন শুইয়া আছেন, হঠাৎ তাঁহার মনে এই ভাব উদিত হইল, ঠাকুরকে গরম গরম ভাল জিনিস (লুচি) ভোগ দিতে হইবে। অমনি উঠিয়া নিজে স্টোভ জ্বালিয়া ময়দা মাখিয়া লুচি তৈয়ারি করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিলেন। তাঁহার নিকট যে কেহ থাকিত সকলেই কিছু না কিছু অনুভব করিত যে সত্য সত্যই ঠাকুর তথায় বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহার ভালবাসাও খুব অদ্ভুত ছিল। যে কেহ তাঁহার নিকট থাকিত বা তাঁহার সহিত মেলা-মেশা করিত তাহাদের যেমন আন্তরিক ভালবাসিতেন তেমনি আবার তাহাদের কল্যাণের জন্য কঠোর ভাব ধারণ করিতেন। কাহারও সামান্য অসুখ-বিসুখ করিলে এত বিচলিত হইতেন যে তাহা আর কি বলিব! ব্রহ্মচারী অথবা সাধু যে কেহ তাঁহার নিকট থাকিত তাহাদের কাহাকেও বাড়িতে বা বন্ধু-বান্ধবের নিকট পত্রাদি ব্যবহার করিতে দিতেন না। ঠাকুর যে তাহাদের একান্ত আপনার জন এ কথা বিশেষ করিয়া শিক্ষা দিতেন। যাহাতে তাহারা প্রাণে প্রাণে ইহা বুঝিতে পারে সেই বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইতেন। ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি বেলুড় মঠে আসেন। ইহাই তাঁহার প্রথম বেলুড় মঠ দর্শন। ইহার পূর্বে মঠ হওয়া অবধি দর্শন করেন নাই! স্বামীজীর সহিত ইহাই তাঁহার শেষ দেখা। এইবারে মান্দ্রাজে ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী না থাকায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া মঠে আসেন। যোগীন বলিয়া একটি নূতন ছেলে ছিল বটে কিন্তু নূতন বলিয়া হয়ত তাহাকে পূজার ভার দেন নাই।

রামকৃষ্ণানন্দ-প্রসঙ্গ

৪

ভরত মহারাজের (স্বামী অভয়ানন্দ) নিকট প্রাপ্ত

ভরত মহারাজ শশী মহারাজের অসুখের সময় মহারাজ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। একদিন শশী মহারাজ হঠাৎ ভরত মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'গ্যাখ্, গ্যাখ্, কি দেখছিস্, দেখতে পাচ্ছিস না? শীঘ্র মাতুর পাত, তাকিয়া সাজিয়ে দে, তু'-প্রস্থ। ঠাকুর স্বামীজী এসেছেন।' ভরত মহারাজ বলিলেন, তিনি নিজে কিছু দেখিতে পান নাই। প্রকাশ মহারাজকে শেষ কয়দিন কাছে আসিতে দেন নাই। তিনি দূরে থাকিয়া সব সেবার বন্দোবস্ত করিতেন। তাহার পর কয়েকদিন গেলে হঠাৎ একদিন চিৎকার করিয়া তাঁহাকে ডাকেন এবং পরে তাঁহার সেবা লন। বাবুরাম মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া একদিন বলেন, 'বাবুরামদা, মা কি তোমাদেরই' ইত্যাদি। বলিতে বলিতে কাঁদিতে থাকেন। ইচ্ছা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে একবার দেখিবেন। বাবুরাম মহারাজ নীচে আসিয়া শরৎ মহারাজকে বিশেষ করিয়া বলেন যাহাতে মাকে দেশ হইতে আনান হয়। তজ্জন্য কৃষ্ণলাল মহারাজ ও গণেন মহারাজ মাকে আনিতে যান। কিন্তু মা আসিলেন না। অগত্যা তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। তাহার কয়েক ঘণ্টা পরেই শশী মহারাজের দেহত্যাগ হয়।

রামকৃষ্ণবাবুকে (বলরাম বাবুর পুত্র) বিশেষ ভালবাসিতেন। অসুখের সময় প্রত্যহ তিনি আসিয়া দুই-তিন ঘণ্টা গল্প করিতেন। তাঁহার সঙ্গ বিশেষ পছন্দ করিতেন। তিনি না আসিলে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আর শশী মহারাজের এক সহোদর ছোট ভাই তিনি অফিস ফেরত ফলাদি লইয়া আসিতেন। তাঁহাকেও ভালবাসিতেন।

কিন্তু তাঁহার গর্ভধারিণী মা আসিয়া কত অপেক্ষা করিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতেন। তাঁহাকে পরে সেকথা জানান হইলে বলিতেন, 'দু' মিনিটের জন্য দেখা করতে দাও। তারপর তোমরাই সরিয়ে দিও।'

তিনি দেওয়ালে ঠাকুব ও মায়ের মূর্তি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের বিশেষ গালাগালি দিতেন। আর বলিতেন যে, 'তোমাদের দেব না তো কাকে দেব ?' তিনি সর্বদা একটা ভাবে থাকিতেন।

প্রভু মহারাজের (স্বামী বীরেশ্বরানন্দ) নিকট প্রাপ্ত

মান্দ্রাজে থাকাকালীন শশী মহারাজ ঠাকুরকে ভোগ দিবার সময় একটি ঘরে স্টোভে গরম গরম লুচি ভাজিতেন আর ঠাঁই করিয়া দিয়া থালায় বেগুনভাজা লবণ দিয়া পরে এক একখানি করিয়া লুচি দিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিতেন। তাহাতে আধ ঘণ্টা হইতে পৌনে এক ঘণ্টা ব্যয় হইত। তাঁহার আমলে ভোগের কাল দীর্ঘ ছিল। পরে শর্বানন্দ-স্বামী মহারাজের দ্বারা ঐ নিয়ম উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করায় মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'শশী যা করে গেছে তাই হবে। সময় বদলান হবে না।' তাঁহার সঙ্গে কাজ করা বড় মুস্কিল ছিল। রান্নার জোগাড় দিত রুদ্র মহারাজ। যেই বলিবেন 'তারপর দে' অর্থাৎ অভিপ্রায় বুঝিয়া যেমন যেমন দেওয়া উচিত তাহাই দিতে হইবে। তাহার ব্যতিক্রম হইলে ভীষণ গালাগালি দিতেন। কিন্তু রুদ্র মহারাজ তাঁহার ধাত জানিতেন। তাই তিনি জোগাড় দিতে পারিতেন।

সময়ে সময়ে তাঁহার মাছ খাইবার ইচ্ছা হইত। হয়ত নিজেই রাঁধিতেছেন, এমন সময় রামু আসিয়া উপস্থিত। তিনি তখন রুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া ভীষণ গালাগালি দিতেন। রুদ্র মহারাজ সরিয়া গেলে, রামু চিৎকার শুনিয়া রুদ্র মহারাজকে বলিল—Swami seems to be very angry. I shall come in the evening.

তাঁহার জামার উপর দুই-একটা পকেটওয়ালা ব্যাগে ঠাকুর ও মায়ের মূর্তি লইয়া বিদেশে যাইতেন।

তিনি গরমের দিনে রাত্রে তৃষ্ণা পাইলে ঠাকুর ঘর খুলিয়া ঠাকুরকে জল দিতেন এবং সারারাত্র বাতাস করিতেন।

মান্দ্রাজের চারিটা ঘর ও একটা দালান ছিল। মহারাজকে লিখিলেন: 'একটা ঘর তোমার, একটা স্বামীজীর, একটা বাবুরাম মহারাজের, একটা ভক্তদের আর বারান্দাটা আমার জন্য।' বাস্তবিক ঐ বারান্দায় তিনি অধিক সময় বসিয়া থাকিতেন। একবার মহারাজের অসুখ হইয়াছে শুনিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, 'যদি রাজাকে না সারাও তবে তোমায় সমুদ্রে ফেলে দেব।'

সত্যেন মহারাজের (স্বামী আত্মবোধানন্দ) নিকট প্রাপ্ত

সত্যেন মহারাজ শশী মহারাজের নিকট মাসখানেক ছিলেন। শশী মহারাজের মুখে শুনিয়াছিলেন ঠাকুর একদিন শশী মহারাজের ঠোঁট দেখিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁরে, তুই যার তার হাতে খাস নাকি?' তখন শশী মহারাজ সকলের হাতে খাইতেন, বিশেষ নিষ্ঠাটি ছিল না। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে ঐরূপ খাইতে নিষেধ করায় তিনি যাবজ্জীবন শুদ্ধসত্ত্ব ও পবিত্র ব্যক্তির হাতে অন্নাদি গ্রহণ করিতেন। তিনি নিজে কুটনো কুটিতেন। তাহাদের লইয়া ক্লাস করিতেন। সে সময়ে আর বাহিরের কাজ বিশেষ করিতেন না। সত্যেন মহারাজের বয়স তখন সতের বছর। ছেলেমানুষ। ওখানকার Zoological Garden (পশুশালা) ইত্যাদি দেখিবার প্রস্তাব কেহ করিলে বলিতেন, 'না, ব্রহ্মচারীর হেথা হোথা যাওয়া ঠিক নয়।' তিনি পছন্দ করিতেন না যে সাধুরা বাহিরে বাহিরে বেশী ঘোরাঘুরি করে। বলিতেন, 'ওতে চিত্ত চঞ্চল হয়।' পছন্দ করিতেন না যে সাধুরা কেহ মঠ ছাড়া বিশেষ কার্য ব্যতীত বাহিরে যায়। তবে নিজে বলিতেন, 'বিকাল বেলা একটু সমুদ্রের

ধারে বেড়িয়ে এস।' নিজে খুব ধ্যান করিতেন। 'রাম রাম' বা 'শিব শিব' হয়ত এক ঘণ্টা আওড়াইতেছেন।

তিনি ভোর তিন-চারিটার সময়ে আমাদের তুলিয়া দিতেন। বলিতেন, 'ধ্যান করগে।' নিজেও দীর্ঘ সময় ধরিয়া ধ্যানাদি করিতেন। পরমানন্দ-স্বামীকে তিনি বিশেষ ভালবাসিতেন।

বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রাপ্ত

সকলের ভাব-ভক্তি হইতেছে দেখিয়া শশি মহারাজ একবার ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন যাহাতে তাঁহারও ঐরূপ হয়। শ্রীশ্রী ঠাকুর বলিয়াছিলেন 'তাহলে কিন্তু আমার সেবা চলবে না।' শশী মহারাজ তাহার উত্তরে বলেন, 'তবে আমার ওতে কাজ নেই। যা হলে আপনার সেবা করতে পারব না তেমন ভাব আমার চাই না।'

একবার ঠাকুর ঘরে গিয়া স্বামীজী পূজায় বসিয়া একটি আস্ত কলা অর্ধেক ছাড়াইয়া ঠাকুরকে দিয়া বলেন, 'এই নাও ঠাকুর, খাও।' যেমন দিয়েছ তেমনি তো দেব।' শশী মহারাজ ইহা দেখিয়া চটিয়া আগুন হইয়া যান। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া স্বামীজীর পৃষ্ঠে সজোরে চপেটাঘাত করেন। স্বামীজী ইহাতে কিছুই বলিলেন না। কিন্তু তাঁহার অন্যান্য গুরুভ্রাতারা চটিয়া অস্থির হইলেন। তখন স্বামীজী বলিলেন, 'ওর কোন দোষ নেই। ওর ভাব থেকে ও ঠিকই করেছে, আর আমার ভাব থেকে আমি ঠিক করেছি। ঠাকুর তো করোর ভাব ভাঙতেন না—একথা তো জানিস।'

স্বামীজী যখন মঠটি করেন তখন বলিয়াছিলেন, 'এ মঠটা শশীর নামেই হোক।'

শশী মহারাজ বাবুরাম মহারাজের চরণে সাষ্টাঙ্গে ভূপতিত হইতেন এবং তাঁহার সেবার জন্য মধ্যে মধ্যে টাকা পাঠাইতেন।

তিনি মান্দ্রাজে ঠাকুর-সেবা কালে ছেলেকে যেমন করিয়া বকে তেমনি করিয়া ঠাকুরের প্রতি ভর্ৎসনা করিয়া স্নানাদি করাইতেন। গরম দুধের বাটি লইয়া 'দুধ খাবে, দুধ খাবে, খাও খাও' ইত্যাদি বলিয়া বকিতে বকিতে ঠাকুরকে খাওয়াইতেন।

কাহারো নিকট কিছু লইবার সময়ে তাহাদের বকিয়া কিছু আদায় করিতেন, নতুবা চাওয়াচাওয়ি গ্রাহ্য করিতেন না। যতবড় লোক হউক না কেন কোন তোয়াক্কা করিতেন না। ক্লাসের ছেলেদের নিকট আটা ইত্যাদি গ্রহণ করিতেন। যিনি দিতেছেন তিনি কিছু দিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিতেছেন এভাব আনিতে দিতেন না।

তুরীয়ানন্দ-প্রসঙ্গ

কাশী রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রম

ডি মেলোর পাগল হওয়ার প্রসঙ্গে হরি মহারাজ বলেছিলেন, 'স্বামীজী বলতেন, "সব অবস্থার ভিতর দিয়ে গেলে শেষে পরমহংস অবস্থা আসে। পাগলামির ভিতর দিয়েও যেতে হয়।" হরিশদা দিনকতক পাগল হয়েছিলেন, নিরঞ্জন মহারাজ তাঁকে একদিন "গোবেড়ন" করায় স্বামীজী বলেছিলেন "শালাকে পুলিসে দিতে হবে দেখছি।"—এই বলে নিরঞ্জন-স্বামীকে ভয় দেখিয়েছিলেন।'

'ঠাকুর বলতেন, "হৃদয় ডঙ্কা মারা স্থান—ধ্যানের জন্য প্রশস্ত। হালদার পুকুরে মাছ ধরতে এসেছে, ছিপ ফেলে বসে আছে তারপর ঘাই মারলো", অর্থাৎ অস্তিত্ব বোধ হল।' 'অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ' (কঠ উ. ২।৩।১৩)।

'ব্যাসদেব উপদেশ করছেন জনককে লক্ষ্য করে। তখন তাঁর সন্ন্যাসী চেলারাও রয়েছে। তারা ভাবলে জনক রাজা কিনা তাই তাঁকে লক্ষ্য করে বিশেষভাবে উপদেশ দিচ্ছেন গুরুদেব। ব্যাস তাদের অন্তরের অভিপ্রায় বুঝে মায়াগ্নি সৃজন করলেন। সেই আগুন সমস্ত মিথিলাকে পুড়িয়ে জনকের সভার কাছাকাছি এসেছে। লোক এসে জনককে খবর দিলে তিনি তাদের প্রতিকারের উপায় বলে দিয়ে ব্যাসদেবকে বললেন, "আমি অবহিত আছি, আপনি উপদেশ করুন।" আর বললেন "মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন মে দহ্যতে কিঞ্চন।" কিন্তু আগুনটা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে দেখে সন্ন্যাসী চেলারা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাদের কৌপীন শুকুচ্ছিল, পাছে পুড়ে যায় এই ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠে কৌপীন রক্ষা করতে গেল। ব্যাসদেব তা দেখে একটু হাসলেন। তাই কথা হচ্ছে "ন লিঙ্গং ধর্মকারণম্" অর্থাৎ বাহ্য লিঙ্গ (বেশ)

ধর্মের কারণ নয়। মুণ্ডকেও (৩.২।৪) আছে, "ন···তপসোবাপ্য-লিঙ্গাৎ" অর্থাৎ বৈরাগ্যহীন তপস্যার দ্বারাও আত্মা লভ্য নন। ত্যাগই আসল লিঙ্গ, কাষায়াদি নয়।'

'ঠাকুর বলতেন, "জেনে শুনে সংসার কর। আমি কারুকে একেবারে ত্যাগ করতে বলি না। নক্স খেলায় বেশী কাটিয়ে জ্বলে যায়, আমি বেশী কাটিয়ে জ্বলে গেছি।" '

' "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ" (ঈশ উ. ৮)—যার যেমন ভাব তার তেমনি লাভ। যাকে যেমনিটা দেওয়া দরকার ঠিক তাই বিধান করছেন—চিরকাল ধরে।'

' "ন ততো বিজুগুপ্সতে" (ঈশ উ. ৬) নিজেকে রক্ষা করতে চান না, কারণ জানেন নিজের মরণ নেই—অমর। গুপ্ রক্ষণে।'

'ভক্তিতে পুংস্ত্ব নেই, স্ত্রীত্ব নেই, জাতি নেই, বয়স নেই অর্থাৎ স্ত্রী হলে হবে না, শূদ্র হলে হবে না বা যৌবনে হবে না কি বাল্যে হবে না ইত্যাদি কিছু নিয়ম নেই। এটা অধ্যাত্মে (অধ্যাত্ম রামায়ণে) আছে। ঠাকুর বলতেন, "সে কিগো, একথা যে অধ্যাত্মে আছে। তবে কি অধ্যাত্ম মিছে ?" '

' "অহং ব্রহ্মাস্মি" শুধু মুখে বললে হবে না, উপাসনা করা চাই। উপাসনা না করলে চিত্তশুদ্ধি হয় না, তত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। চিত্তশুদ্ধিই দরকার, না হলে তিনি তো সকল হৃদয়ে আছেনই।'

' "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা" (মুণ্ডক উ. ৩।১।৫) এই সব উপায়। গুরুসেবা দরকার। রাধেশ্যাম সম্প্রদায়ের প্রবর্তক গুরুসেবা করে শক্তি পেয়েছিলেন। তাঁর গুরুর জন্য অনেকদূর থেকে যমুনার জল কলসি করে নিজে নিয়ে আসতেন। তাঁর টাকা ছিল, ইচ্ছা করলে চাকর রাখতে পারতেন, কিন্তু তা করেননি। গুরু যে তাঁর বিশেষ শক্তিমান ছিলেন তা নয়। কিন্তু নিজের শ্রদ্ধাতেই হয়েছিল। গুরু বিশেষ শক্তিমান হলে তো কথাই নেই। একলব্য মাটির দ্রোণ গড়ে সিদ্ধ হয়েছিল।'

৭ই ফেব্রুয়ারী—১৯২১

হরি মহারাজ বললেন, “ভাগবত ভক্ত ভগবান, গুরু আর নাম এক বপু”—ভাগবতের সেবা করলেই সবার সেবা করা হল।’

প্রশ্ন: মহারাজ ‘যত মত তত পথ’ ঠাকুরের এই কথার অর্থ কি?

উত্তর: সকল মতগুলোই পথ এবং লোকে এক জায়গায়ই পৌঁছায়।

প্রশ্ন: দ্বৈত অদ্বৈত কি এক স্থানেই নিয়ে যায়?

উত্তর: হ্যাঁ, সেই এক ভগবানকেই লাভ হয়।

দৃষ্টান্ত দিলেন ঠাকুরের কথায়: গরুর লেজে হাত দিলে বা শিং-এ হাত দিলে সেই গরুতেই হাত দেওয়া হয়! গোমুখীতে স্নান, কাশীতে স্নান আর কলিকাতায় গঙ্গাস্নান করলে সেই এক গঙ্গাতেই স্নান করা হয়।

প্রশ্ন: শাস্ত্রে বলে ব্রহ্মলোক হতেও মানুষ ফেরে। দ্বৈতবাদীর শিবলোক, বিষ্ণুলোক ইত্যাদি তো তারি মধ্যে। তাহলে তাদের মুক্তি হয় কি করে?

হরি মহারাজ প্রশ্ন করলেন: মুক্তি কাকে বল?

উত্তর দিলাম: বারবার সংসারে গতায়াত-নিবৃত্তিই মুক্তি।

হরি মহারাজ: কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদি না থাকলেই সংসার থেকে নিবৃত্তি। ঐসকল ‘লোকে’ কাম ক্রোধ নাই। কেবল উপভোগ, আনন্দ—ভক্তদের কাছে।

প্রশ্ন: শাস্ত্রের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য কোথায়?

বিরক্ত হয়ে বললেন, একটা ভাব নিয়ে থাকতে হয়, তাতে নিষ্ঠা চাই। হাজার ‘লোক’ থাকুক—তাতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি না হয়—তাহলে তুমি নির্বাণকামী। বেশ, তাই হও। গীতাও বলছেন, ‘শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা। সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥’ (২।৫৩) নিশ্চলা বুদ্ধি হলে তবে যোগ ঠিক ঠিক

হয়। সাধন ভজন খুব করলে একটা *terra firma* অবস্থায় পৌঁছান যায়। 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি' চাই। কেবল খোসা, বাহ্য ব্যাপারে রত থাকলে কি হবে।

জয় বিজয় বৈকুণ্ঠ থেকে শাপগ্রস্ত হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন বলায় পূজনীয় মহারাজ বললেন, 'ওসব ভগবানের লীলা।'

প্রশ্ন: ঔপনিষদ পুরুষের (বৃ উ. ৩৷৯৷২৬) জ্ঞান মুক্তির প্রযোজক। ভক্তের ঐ জ্ঞান কিভাবে হয়?

উত্তর: কি মাথামুণ্ডু বলছ, ভগবানের সঙ্গে ঔপনিষদ পুরুষের তফাত কোথায়? ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা হলে ঔপনিষদ পুরুষকেই প্রত্যক্ষ করা হল।

প্রশ্ন: কৃপা কি?

উত্তর: ভক্তের কাছে কৃপা, জ্ঞানীর পুরুষকার—ভাবের বিভিন্নতা। কৃপা বাতাস তো বইছেই, চিত্ত শুদ্ধ হলে কৃপা বোধ হয়। জগাই মাধাই প্রেমের স্পর্শ পেয়েছিল—তাতে তাদের চোখ খুলে গেল—চিত্তশুদ্ধি হতে লাগল, তখন কৃপা বুঝল। জ্ঞানীর ভাব, আমি মায়ের সন্তান। কৃপা আবার কি? As a matter of right মাকে পাব। মথুরের ছেলে ত্রৈলোক্য যেমন মায়ের জমিদারীর টাকা দাবী করত। নিজেকে আর ভগবানকে তফাত বোধ না করা জ্ঞানীর স্বভাব। ভক্ত ভগবানের উপর নির্ভর করে, জ্ঞানী নিজের (আত্মার) উপর নির্ভর করে। জ্ঞানীর আত্মা ও ভক্তের ভগবান একই ভাবটাই কেবল তফাত।

'মানুষ কিছুতেই নিজের হার স্বীকার করতে চায় না। হৃদুর ছেলে আড়াই বছর বয়স। ঠাকুর নগ্নাবস্থায় নিজের ..... দেখিয়ে তাকে বলছিলেন, "তোর চেয়ে আমার বড়" ইত্যাদি (ঠাকুর বলতেন, পরমহংসগণ বালকভাব আরোপ করার জন্য বালকদের দ্বারা সর্বদা পরিবেষ্টিত থাকতে ভালবাসেন)। বারংবার ঐ কথা বলায় ছেলেটা বললে, "আমার বাবার এত বড় (মস্ত বড়)।"

'ভান করেও সময় সময় বালকের মত বাহ্য আচরণ কেউ কেউ অনুকরণ করে। একটা গল্প আছে। এক রানী পরমহংস-পূজার জন্য বেরিয়েছিলেন। তারপর একজন সাধু তাঁর কোলে গিয়ে বসে, রানী তাকে খাওয়ান। পরে সাধু তাঁর কোলে বাহ্যে করে দেয়। শেষে রানী test (পরীক্ষা) করার জন্য সেই গু নিয়ে একটু তার মুখে যেই দিতে গেলেন অমনি তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন।'

'ঠাকুরের চোখের পালক বার বৎসর পড়েনি। আয়না ধরে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখতেন, তবুও পড়ত না। বলতেন, "ওগো, আমার কি রোগ হল গো।" মহাবায়ু উঠে দৈহিক সব নিয়ম উলট্ পালট্ হয়ে গেছিল।'

হরি মহারাজের নিকট গেলাম। শরীর কেমন আছে জিজ্ঞাসা করায় বললেন—'শরীর—"শীর্যতে ইতি শরীরম্"—যা ক্ষয় হয় তাই শরীর, ওর আর থাকা-থাকি কি? কিন্তু স্বামীজী বলতেন, "এর মধ্যে মজা এই যে, এরি ভিতরে সেই আদত মাল রয়েছে।" কিন্তু তিনি শরীরটার ভিতরেই যে আছেন তা নয়, বাহিরেও রয়েছেন—নিত্যই আছেন। "সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য অহম্ ইদম্ মম ইদম্ ইতি নৈসর্গিকঃ অয়ং লোকব্যবহারঃ।" (অধ্যাসভাষ্যম্) ব্যবহার যা কিছু সব প্রকৃতির। মূল প্রকৃতিটার অনেকটা বিকৃত হয়ে এই সংসার হয়েছে কিন্তু সবটা বিকৃত হয়নি। খানিকটা দুধ দই হয়েছে। বাকী দুধ দুধই আছে। "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।" (গীতা, ১৩।২০) অবিদ্যানাশ হলেই সংসার নাশ হল কিন্তু নির্বাণেতে মূল প্রকৃতিই নাশ হয়ে যায়। যে সমাধিতে দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন লয় হয় তাতেও মূল প্রকৃতি পর্যন্ত চলে যায়। জ্ঞানলাভের পর দেহ নাশ হওয়াই নির্বাণ। মুক্তি তো রয়েইছে, আত্মার তো কখন বন্ধন হয়নি, তবে সেইটা জানা। কি যেন একটা "পেঁচ" হয়েছে তাতেই সংসারদশা এসেছে। কিন্তু সেই "পেঁচ"টা জানতে পারলেই মজা। তখন ধোঁকার টাটি সংসার কেটে যায়।'

প্রশ্নঃ আমি দ্রষ্টা, আর এই সব দৃশ্য, এরূপ তো একটা ধ্যান হতে পারে।

উত্তর : হ্যাঁ, এরূপ একটা সাধন আছে, মনই সব দেখে—মনই দ্রষ্টা—দেখছে আমার মন যন্ত্রই। কিন্তু ঐখানেই সব শেষ হল না। 'যত্র যেনানুভূয়তে তত্রৈব সাক্ষিত্বং' কিন্তু 'যত্র যেন নানুভূয়তে তত্র সাক্ষিত্বং নোপযুজ্যতে' অর্থাৎ সাক্ষিত্বের উপরে যেতে হবে। এসব কথা তো রোজ শোনা যাচ্ছে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না—'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা' (মু. উ. ৩।১।৮) বুদ্ধিরও গোচর নন, কিছুরই গোচর নন। 'শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ' (কঠ উ. ১।২।৭) ইত্যাদি। 'আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ' (কঠ উ. ১।২।৭)।

শর্বানন্দ-স্বামীর প্রশ্ন : কুলকুণ্ডলিনী জাগলে কি কোন sensation হয়? উত্তরে হরি মহারাজ বললেন, 'হ্যাঁ হয়। ঠাকুর বলতেন, "সাপের গতির মতো এঁকে বেঁকে ওঠে। উঠে পরমশিবের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। সাধারণ জীবের লিঙ্গ গুহ্য নাভিতে স্থিতি হয়, তাতে আহার নিদ্রা রমণ ইত্যাদি হয়।" তারপর হৃদয়ে ওঠে সেখানে জ্যোতি দর্শন হয় কিন্তু সেখান থেকেও নামে। তারপর কণ্ঠে যায় সেখান থেকেও নামে—সে অবস্থায় ভগবৎ-কথা ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। কিন্তু কণ্ঠ পার হয়ে গেলে আর নামে না। সে অবস্থায় খাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে আসে—জ্যোতিতে জ্যোতি মিশে যায়। শরীর একুশ দিন মাত্র থাকে। তখন নানা রকম দর্শন হয়। হৃদয়ে উঠলেই খাওয়া দাওয়া কমে আসে।' "অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।"—মুখ দেখাইয়া বলিলেন, 'এইটা প্রাদেশ পরিমাণ স্থান, এখানেই consciousness-এর (চৈতন্যের) বেশী প্রকাশ। স্বামীজীর সমস্ত দেহের জ্ঞানটা ঐ জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল—সে সময় শরীরটা অসাড় বোধ হয়েছিল, কিন্তু মুখটার মাত্র জ্ঞান ছিল। এই জন্য জ্ঞানীদের শরীর হাজার খারাপ হলেও মুখের উজ্জ্বলতা ঠিকই থাকে। ঠাকুরকে দেখেছি চলতে পারছেন না, পা এখানে ওখানে পড়ছে, শরীর জীর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু

মুখের কোন বিকৃতি নেই, মুখটা তম্‌তম্‌ কচ্ছে (জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে)।'

সরস্বতী পূজার প্রসাদ (বাসি) খেতে খেতে মহারাজ বললেন, 'আহুতি দেই শ্যামা মাকে।'

হরি মহারাজ : দেখ একই কর্মে কেউ বদ্ধ হচ্ছে, সাধক তাতেই মুক্ত হচ্ছে। সিদ্ধ পুরুষ 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি' দেখছে। ভাবের তফাতে সব তফাত হয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : আচ্ছা তবে খারাপ কাজ (হীন কর্ম) বলে কি কিছু নেই?

উত্তরে বললেন : না খারাপ বলে কিছু বলা যায় না। সাধক সব জিনিসকেই spiritualise (আধ্যাত্মিক ভাবে রূপান্তরিত) করে ফেলে।

প্রশ্ন : তন্ত্রের সব ব্যাপার নানা রকমের আছে যাকে এ সৃষ্টিতে হীন বলা হয়, সেগুলিও কি খারাপ নয়?

উত্তরে বললেন : না সেগুলিও খারাপ নয়। যা ভগবানের দিকে নিয়ে যায় তাই ভাল আর, যা সংসারের দিকে নিয়ে যায় তাই খারাপ। গিরিশবাবু একবার কর্তাভজাদের কথা নিয়ে ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'ওদের ওসবগুলো বড় খারাপ, ওর বিষয় নাটক লিখতে হয়। আপনি কি বলেন, ওসবগুলো খারাপ নয় কি?' ঠাকুর থাকতে না পেরে বললেন, 'ও কথা কি করে বলি, দেখছি ওদের মধ্যেও সিদ্ধ হয়েছে। সুতরাং খারাপ কি করে বলি! ছাখ্‌, বাড়ি ঢুকতে পাইখানার দরজা দিয়েও তো ঢোকা যায়—মেথর তো সেই পথ দিয়েই ঢোকে তবে তোমাদের ও পথ দিয়ে যেতে বলছি না।'

হরি মহারাজ conclude (সিদ্ধান্ত) করলেন : 'অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে বলি না, তবে লোক খারাপ বললেই যে, সে পথ দিয়ে ভগবানের দিকে যাওয়া যায় না একথা কিছু বলা যায় না। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে কিছুই খারাপ নেই।'

ডি মেলোর পাগলামির কথা উঠল। হরি মহারাজ বললেন,

'পাগলামিটা পবিত্রতা লাভের একটা পূর্বাবস্থা যে নয় একথা কে বলতে পারে? হরিশদা ও লাটু মহারাজের জীবনে ঐরকম দিন কতকের জন্য হয়েছিল। নিরঞ্জন-স্বামী হরিশদাকে বেজায় পাখা পেটা করেছিলেন, তাতে স্বামীজী বলেছিলেন, "তুই গুণ্ডা, তোকে পুলিশে দেব।"—এই বলে কাগজ নিয়ে কলম নিয়ে বসেছিলেন—দরখাস্ত লেখার জন্যে। "আমাদের মধ্যে গুণ্ডার স্থান নেই, আয় শালা, আমার সঙ্গে আয় দিকি"—এই বলে ঘুষি পাকিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন, "সিদ্ধ হবার আগে ঐরকম পাগলামি অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়।" কে জানে সিদ্ধ :হবার আগে ঐরকম একটা অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয় কিনা।'

মহারাজ বললেন, 'যশোদার মুখ কৃষ্ণ চেপে দিলেন, ব্রহ্ম শব্দ মুখ দিয়ে বেরুল না (ভা. ১০।৮।৩৬-৪৩)। নারদকে উপদেশ দিতে এলেন, failure (বিফল) (ভা. ১।৬।১৬-২৮), কিন্তু দেবকী ও বসুদেবের উপদেশ পেয়ে মুক্তি হল (ভা. ১০।৩।২৪-৪৫ দেবকীর স্তব)। ঠাকুর বলতে বলতে ডুকরে উঠলেন, ঘরশুদ্ধ লোক (১৫০।২০০) স্তব্ধ হয়ে গেল।'

'গোপালের মার কথা শুনে স্বামীজী কেঁদে ফেললেন আর সব সত্য বলে বিশ্বাস করলেন। ঠাকুর স্বামীজীকে রহস্য করে বললেন, "সে কি, তুই এসব কথা বিশ্বাস করলি?" '

'প্রত্যেক রোমকূপে রমণ-জনিত যেরকম সুখ বোধ হয় সে রকম সুখ হয়। ভাবে থ্যাচে কেন? মানুষ একটা ইন্দ্রিয় সুখে মগ্ন হয়ে বেহুঁশ হয়ে যায় আর যাতে অত আনন্দ তা পেয়ে ধারণ করতে পারে কি করে, তাই থ্যাচে খুঁচে।'

যশোদাকে বিশ্বরূপ-দর্শন ও গোপালের বাল্য-লীলা শুনে 'শ্রীশ্রী ঠাকুর আনন্দে ভরপুর হয়ে গেলেন। বললেন, "নবম স্বর্গ পর্যন্ত তুচ্ছ।"'

রামলালার কথা উঠলো। হরি মহারাজ বললেন, 'খই-এ ধান রয়েছে দেখে ঠাকুর বলতেন, "মা যশোদা যে মুখে ক্ষীর সর দিতেন

আমি সেই মুখে খই দিচ্ছি, তাতে আবার ধান!" বলেই ভাবান্তর হল। তিনি চড় মারতেন, বলতেন "ঝাঁপাই ঝুড়িস্‌নি।" '

মধুরভাবের কথা উঠল। মহারাজ বললেন, 'বড় শক্ত। শুনলে কাম চলে যায়। "কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্‌" (ভাঃ ১০।৩১।৭)। কামের কি সুখ? হাড় চিবিয়ে, দাঁতের রক্ত চেটে কুকুর যে সুখ পায়, সেখানেও বাস্তবিক আত্মসুখ।'

৩রা এপ্রিল ১৯২১

আজ ভাগবতপাঠের পর এক ঘণ্টা ধরে হরি মহারাজ কথাবার্তা বলতে লাগলেন। বিষয়—প্রেমতত্ত্ব। প্রথমতঃ বৃন্দাবনে থাকাকালীন প্রসিদ্ধ বাবাজীদের দর্শন সর্বদা করতেন। বাবাজীরা প্রায়ই গোঁড়া কিন্তু কেউ কেউ উদার। গোঁড়ারা সময় সময় সন্ন্যাসী নাম শুনেই তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এক-আধজন উদারও পাওয়া গেছে। জনৈক উড়িয়া বাবাজীর নিকট একবার হরিবাসরে (একাদশী) হাজরার জন্য জল চাইতে গিছলেন। বাবাজী কিছুতেই জল দিতে চাইলেন না; বললেন, 'জলাভাবে যদি হরিবাসরে মৃত্যু হয় সেও শ্রেয়ঃ তবু জল দেব না।' হরি মহারাজের তখন কম বয়স। খুব গালি দিয়েছিলেন, বাবাজী তবু চটেননি। বরং পরে যখন দেখা হয়েছিল তখন খুব যত্ন করেছিলেন। কালনার ভগবানদাসের শিষ্য, জনৈক বাবাজীর বয়স ১২০ হয়েছিল, তালগোল পাকিয়ে গিছলেন, কিন্তু সংকীর্তন শুনলে ফুলে উঠতেন—স্বচক্ষে দেখেছিলেন। অনেক ভজনানন্দীও বাবাজীদের ভেতর দেখা যায়। ভগবানদাস নামব্রহ্ম মানতেন। সাকারে ঝোঁক ছিল না কিন্তু সগুণ মানতেন।

ক্রমে ভক্তি ও প্রেমতত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ হল। পূজনীয় হরি মহারাজ বললেন, 'বৃন্দাবনে জীব গোস্বামী প্রথমে বড় শুষ্ক জ্ঞানী ছিলেন—তাঁর জ্যাঠা ও খুড়ো, সনাতন ও রূপগোস্বামী কৌশল করে তাঁর যখন কুড়ি-একুশ বছর বয়স তখন একটা পনের-ষোল বছরের গোয়ালিনীর সঙ্গে তাঁর ভাব করিয়ে দেন। ক্রমে ভাব যখন জমে

এল তখন গোয়ালিনীটাকে সরিয়ে দিয়ে সেই প্রেম ঈশ্বরের অভিমুখী করবার জন্য উপদেশ করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর রসতত্ত্বের বোধ হল ; ভাব-ভক্তি পেলেন। উত্তম শিক্ষক হলে এমনি হয়। চণ্ডীদাস পড়ে কতদিন কেঁদেছি। চণ্ডীদাসেরও রজকিনীর উপর প্রেম হয়েছিল, ক্রমে তিনি রজকিনীর মধ্যে ইষ্ট দেখেন, রজকিনীও তাঁর ভিতর ইষ্ট দেখেছিলেন। কারোর উপর ভালবাসা থাকা দরকার। ঠাকুর প্রায়ই সবাইকে জিজ্ঞাসা করতেন, "কার ওপর তোর ভালবাসা আছে ?" শরৎ মহারাজকেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "কাউকে নয়", তাতে তিনি চটে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন "যা শালা, তুই ভারি শুক্নো"। কারো উপর ভালবাসা থাকলে সেটা ঈশ্বরের দিকে direct (নিয়ন্ত্রিত) করা যায়। যদি ভালবাসতে গিয়ে একটু কাম এসে পড়ে, তাতেও ক্ষতি নেই। যৌবনেই ভালবাসাদি ফোটে, বুড়ো বয়সে ওসব হয় না। তবে আর এক রকম আছে, কাম থেকেই ভালবাসা, সেটা হীন থাকের। কাম চরিতার্থ করা তার মুখ্য উদ্দেশ্য। বালককালেও সহপাঠিদের মধ্যে কারো কারো উপর বিশেষ ভালবাসা হয়।'

'আত্মার উপর যে ভালবাসা—সর্বভূতে তিনি আছেন এই ভেবে যে ভালবাসা সেটা খুব উঁচু থাকের বটে তবে সেটা rare (দুর্লভ) জিনিস। সে হলে তো কথাই নেই। তা না হলেও কারোর ওপর ভালবাসা থাকাও খুব ভাল।'

৩রা এপ্রিল ১৯২১

পূজনীয় হরি মহারাজ বললেন—'স্বামীজী আমাকে বলেছিলেন—"হরি ভাই, এবার নূতন ব্রহ্মচর্য সৃষ্টি করব। শিব জ্ঞানে জীব সেবায় সে ব্রহ্মচর্য থাকবে। প্রত্যক্ষ সেবা ভগবানের করে ধন্য হবে।" কিন্তু স্বামীজী বলে গেলে কি হবে আমাদের এমন অদৃষ্ট যে তা নেব না। ফুস্‌ মন্ত্রে যদি কিছু হয় আমরা তাই চাই। (রাধিকামন্ত্র নিয়ে আসবার জন্য জনৈক ব্যক্তি মঠে গিয়েছিল—সে প্রসঙ্গে সব কথা

হতে লাগল।) তিনি বললেন, কিন্তু তা কি হয়? হরগৌরী একবার যাচ্ছেন। পথে শিবের একজন খুব ভক্তের সঙ্গে দেখা হল। গৌরী বললেন, "তুমি তো বড় নিষ্ঠুর, এ লোকটা তোমায় এত করে ডাকে এর একটা কিনারা কর না।" শিব বললেন, "আমি কি করব? ওর অদৃষ্টে নেই।" গৌরী বললেন, "ওকি কথা? তুমি মনে করলেই দিতে পার। দিয়ে দেখ দিকি।" তখন শিব বললেন, "আচ্ছা আমি দিচ্ছি কিন্তু ওর বরাতে নেই, দিলেও হবে না।" এই বলে শিব একটা টাকার তোড়া বেঁধে সেই লোকটা যে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, সেই পথের মাঝে ফেলে দিলেন। লোকটা এমনি বেশ যাচ্ছিল কিন্তু যেখানে সেই তোড়াটা পড়ল তার একটু দূর থেকেই বললে, "আচ্ছা অন্ধ লোকে কেমন করে যায় একবার দেখি।"—এই বলে চোখ বুজে সেই জায়গা দিয়ে যেতে লাগল। তারপর সেই স্থানটা পেরিয়ে যেমন চলছিল তেমনি চলল। তাই দেখে শিব গৌরীকে বললেন, "দেখলে অদৃষ্টের ফের।"'

৫ই এপ্রিল ১৯২১

হরি মহারাজ বললেন—'স্বামীজী একবার আমেরিকায় লেকচার দিচ্ছিলেন। তাঁর শ্রোতার মধ্যে একজন রমণীকে খুব সুন্দরী বোধ হওয়ায় যেমনি তাকে দেখবার জন্য তার দিকে দ্বিতীয়বার চাহিলেন অমনি একটা বাঁদরীর মত (কুৎসিত) মুখ দেখতে পেলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন, "Higher power (উচ্চতর শক্তি) ওরূপ করে রক্ষা করেন।"'

পূজনীয় হরি মহারাজ বললেন—'আর একবার ওদেশে যাবার আগে স্বামীজী স্বপ্নে এক পরমাসুন্দরী নারীমূর্তি দেখেন, ঘোমটা দেওয়া। তাঁর কৌতূহল হল মুখটা দেখার জন্য। স্বপ্নেই যেমন ঘোমটা তুলেছেন অমনি দেখেন ঠাকুরের মুখ।'

'স্বামীজীর রূপে ও সুমিষ্ট গলায় অনেক সাফল্য হয়েছিল। ওসব ঐশ্বরিক ব্যাপার। অমন সুমিষ্ট গলা আমরা শুনিনি। আর কি

রূপ ছিল। চোখ ফেরান যায় না। আর পবিত্রতা! তিন জন যুবতী সর্বদা তাঁর সঙ্গে মিশত দেখে মিশনারীরা এসে তাদের বাপের কাছে বলল, "তোমার সমাজে নিন্দা হবে, এ লোকটা rogue etc. (ভণ্ড ইত্যাদি) কিন্তু তাদের বাপ বললে, "এ লোকটা যদি ভণ্ড হয়, তবে তোমার ধর্ম মানি না, ঈশ্বর মানি না।" '

৮ই এপ্রিল ১৯২১

হরি মহারাজ বললেন—'গত কাল রাত্রে যখন কানের যন্ত্রণায় খুব কষ্ট হচ্ছিল তখন উঠে বসলুম—প্রাণবায়ু সম করে মনকে সমভাবে ধারণ করলুম। rhythmical breath (শ্বাস-প্রশ্বাস ছন্দোময়) হল। দেহ থেকে মন উঠল তখন মনে হতে লাগল কোথায় যেন যন্ত্রণা হচ্ছে। ' নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম।" সম হচ্ছে ব্রহ্ম। একটুতেই অধৈর্য হলে চলবে না, সেটা জ্ঞানীর লক্ষণ নয়, আবার ভক্তেরও লক্ষণ নয়। ভোগীর লক্ষণ। ঠাকুরের যখন খুব যন্ত্রণা তখন একদিন ইসারা করে দেখিয়ে বললেন "ভারি কষ্ট।" আমায় কিন্তু দয়া করে দেখাচ্ছেন সচ্চিদানন্দ মূর্তি। সুতরাং আমি বললাম sincerely (অকপটভাবে) "না আপনার আবার কষ্ট কই।" প্রথমটা বললেন, "ওই তোমাদের এক কথা।" খানিক চুপ করে থেকে খুব খুসী হয়ে বললেন, "ঠিক বলেছ।" বললেন, "দুঃখ জানে আর দেহ জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো।" সেই সব দেখেছি কিনা সেই জন্য এখন কাতর হই না। তোমরা একটুতে এলিয়ে পড়, ওটা ভাল নয়। ভাববে আমি আত্মা, জোর করে সব তাড়িয়ে দেবে তাহলে সব পালাবে, না হলে সব চেপে ধরবে। আর যদি নিজেকে ভক্ত ভাব তাহলেও এলিয়ে পড়া উচিত নয়। "তারকাশ্চর্বয়ামঃ, রামকৃষ্ণতনয়া বয়ম্।"— এই ভাব হবে। এলিয়ে পড়াটা না জ্ঞানীর ভাব, না ভক্তের ভাব— ওটা ভোগীর ভাব।'

রাত্রে অনেক কথা হল। পূজনীয় হরি মহারাজ বললেন— "বিয়ে করব না এটা ছোটবেলা থেকে ধারণা। আমার খুব অল্প

বয়স তখন গঙ্গাধরকে বলেছিলুম "দেখ, সকল স্ত্রীকে মা বলতে পারি।" সে বললে, "আমি একজনকে বাদে সবাইকে পারি।" যখন বার তের বছর বয়স তখন ঠাকুরের দর্শন হয় বটে কিন্তু যখন পনের ষোল বছর তখন বেশ ঘনিষ্ঠভাবে মেশা হয়। সেই ক' বছরের মধ্যে একদিন কেবল তাঁকে গেরুয়া পরে জপ করতে দেখেছিলাম। ভক্তদের ইচ্ছা হয় নিমাই-সন্ন্যাস কেমন হয়েছিল একবার দেখবেন। তাই তিনি একদম নেড়া হয়ে দাড়ি গোঁপ ফেলে গেরুয়া পরে রুদ্রাক্ষ মালা জপ করছিলেন। আমিও দেখি এবং মহাপুরুষ বলেন যে তিনিও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। তিনি কয়েকজনকে গেরুয়া দিয়েছিলেন। গোপালদা তাঁর কাছে থাকাকালীন অনেক সময় গেরুয়া পরতেন। ভজন করতে খুব বলতেন। কানে মন্ত্র দিতেন কিনা ঠিক জানি না। তবে জেনে নিতেন, বলতেন, "তোর কোন মূর্তি ভাল লাগে?" তারপর একটা suggest (প্রস্তাব) করতেন। আমি বাড়িতেই মন্ত্র নিয়েছিলুম। তিনি একদিন সে কথা জিজ্ঞাসা করলেন আর যে মূর্তি ধ্যান করি এবং যে মন্ত্র জপ করি সব তাঁকে বললুম। তিনি দু-একটা কথা suggest (প্রস্তাব) করলেন। তবে নির্জনে নিয়ে গিয়ে বুক ছুঁয়ে দিতেন। তাতে দর্শনাদি হত এসব জানি। তাঁকে পৈতা পরতে কখন দেখিনি। তবে তাঁর মুখে শুনেছি ভট্টাচার্যদের ভয়ে সময়ে সময়ে একটা পৈতা পরতেন। কিন্তু সেটা আপনিই খসে যেত। ঘর ঝাড়ু দেবার সময় হয়ত খুঁজে পাওয়া যেত।'

১১ই এপ্রিল ১৯২১

হরি মহারাজ বললেন—'রূপ দর্শন হলেই হয়ে গেল বা রূপ দর্শন না হলে spiritual advancement (আধ্যাত্মিক উন্নতি) হচ্ছে না এ সব কথা ঠিক নয়। যদি কোন ভক্ত দেখতে চায়, তিনি দেখিয়ে দেন। কিন্তু এমন লোক দেখেছি যিনি রূপাদি দেখেননি অথচ খুব উন্নত। তখন পবিত্র আনন্দ অনুভব হবে। অনুভব আর

কি, সেটা তো আছে, খুলে যাবে। আত্মরূপে তাঁর উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। রূপটুপও মিথ্যা নয়। তাঁর জগতে কি হতে পারে আর কি পারে না কিছু বলা যায় না। তবে সমাজস্থিতির জন্য এসব মত প্রচার করা ঠিক নয়—ব্যভিচার হতে পারে। কিন্তু Truth is truth—deny (সত্য যা, তা সত্য—অস্বীকার) করা যায় না। ন্যায় অন্যায় কিছুই বাস্তবিক নেই। সবই ব্যবহারিক দিক থেকে সত্য।'

'গান্ধী স্বামীজীকে ঠিক বুঝেছেন—তাঁর line এ (প্রদর্শিত পথে) work (কাজ) করছেন।'

'ভক্তের মধ্যে ভগবানের ঐশ্বর্য এসে পড়ে। খুব সাত্ত্বিক ভাব বৃদ্ধি হলে সেইগুলি ফোটে। ভক্ত ভগবানের চেয়ে বড়। নারদ একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "প্রভু আপনার চেয়ে কেউ বড় আছে কি?" ভগবান বললেন, "এই তোমরাই আমার চেয়ে বড়। আমি অনন্ত কিন্তু সেই আমাকে তোমরা হৃদয়ের এক কোণে পুরে রেখেছ।" '

'সারূপ্যাদি মুক্তিতে ভগবানের অলঙ্কার বা অস্ত্রাদি হয়ে থাকা।'

১৪ই এপ্রিল ১৯২১

পূজনীয় হরি মহারাজ বললেন, 'বন্ধন মানে বাঁধা, মুক্তি হচ্ছে সেইটি খুলে দেওয়া। সকলেরই এক একটি গ্রন্থি আছে, শাস্ত্রে যাকে হৃদ্‌গ্রন্থি বলে, মা সেইটি খুলে দেন। এখন মুক্তি ও বন্ধন সম্বন্ধে যা জানছ সেইটি বন্ধন। বন্ধনের ভিতর থেকে মুক্তি জানা যায় না। মুক্ত হলে বন্ধন দেখতে পাওয়া যায় না।'

'ভগবান মুচকুন্দকে বললেন, "রাজন্, তুমি অনেক হিংসাদি কার্য করেছ সেই প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয়ের জন্য মুক্ত হয়ে পর্যটন কর। আগামী জন্মে ব্রাহ্মণ শরীর লাভ করবে।" ' (ভা. ১০।৫১।৬৩)

'সেই শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায় যাওয়া চাই।'

'তোমরা একটু করলেই হয়ে যায়। প্রবাহপতিত—যে স্রোতে পড়েছ, একটুতেই হয়ে যাবে। এ সুযোগ সকলের ঘটে না। এ সুযোগ নষ্ট করতে নেই।'

'বন্ধনদশায় থেকে জীব মোক্ষের ধারণা পর্যন্ত করতে পারে না। মুখে বললে হবে কি "মোক্ষটা বুঝেছি"। জগদম্বার কৃপায় যার বন্ধন ছুটে যায় সেই বুঝতে পারে। সকল জীবহৃদয়ে একটা ফাঁস, বন্ধনের পাশ আছে। তাকে হৃদ্‌গ্রন্থি বলে। ওসব কবির কল্পনা নয়—যথার্থই ফাঁস। যার সেই বন্ধনপাশ কেটে যায় সে তখন ভাবে বন্ধনটা হলই বা কেমন করে, আর গেলই বা কেমন করে! এ সব তর্কের ব্যাপার নয়। ধীরভাবে বুঝতে হবে। শাস্ত্রজনিত শুভ সংস্কার মনে জমাতে হবে। সকল আসক্তি ছাড়তে হবে। আসক্তিটাই তো বন্ধন। জীবকে কোন না কোন বিষয়ে এই আসক্তিই বেঁধে রেখেছে। যখন আসক্তি চলে যাবে তখন স্পষ্ট বোধ হবে একটা মস্ত বন্ধন খুলে গেল। এসব বিষয় খুব আলোচনাও ভাল, শুনে রাখলে ঠাকুর বলতেন, পরে কাজে লাগবে। সেগুলো মিলিয়ে নিতে পারবে। সত্ত্বগুণ মোক্ষের দিকে খুব এগিয়ে দেয়। সত্ত্বগুণ বাড়ান চাই, এই জন্যই মুচকুন্দকে ভগবান বললেন, "তুমি ক্ষত্রিয়জন্মে মৃগয়াদিতে অনেক পশু বধ করেছ, তপস্যা কর পরজন্মে ব্রাহ্মণকুলে জন্মাবে।" ভগবৎ-সাক্ষাৎকার মাত্রেই মুচকুন্দ মুক্ত হয়ে গেল সত্য। তথাপি যে দেহধারণ, সে দেহধারণ বন্ধন-জনিত নহে, জীবন্মুক্তি অনুভবের জন্য। "তাঁর" হয়ে গিয়ে যদি কেউ দেহধারণ করে তবে তার দেহাভিমান থাকে না—সে মুক্ত হয়ে সংসারে থাকে। তোমাদের ধারণা মুক্তি হলেই লয় হওয়া চাই। তা নয়। অভিমান যাওয়ার নামই মুক্তি—তাছাড়া মুক্তি আর কার নাম?'

২০শে এপ্রিল ১৯২১

স্বামীজী হরি মহারাজকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে চাইলে হরি মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন, 'কি করতে হবে বল?' তিনি প্রথমে বলেছিলেন—'আমি কি বলব, মা বলে দেবেন যা করতে হবে। কাজ আমার না তোমার!' তারপর দু-চারটি কথা বলেন। প্রথম বল্লেন

—'Forget India', (ভারতকে ভোল) দ্বিতীয় বলেন—'আশ্রম কর', তৃতীয় বলেন,—'Live the life of renunciation. (ত্যাগীর জীবন যাপন কর)'

হরি মহারাজ বললেন—'আমি প্রথমটায় আমেরিকায় যেতে চাইনি। দেহটা ও দেশে যায় এ আমার ইচ্ছা নয়। পরেও একশবার ডেকেছে কিন্তু তবু গেলাম না।'

'স্বামীজী বলেছিলেন, "তোমরা আমার ভাব নিতে পারলে না—কিন্তু কেউ না কেউ নেবে।" '

২৫শে এপ্রিল ১৯২১

কেমন গরম ইত্যাদি প্রসঙ্গে হরি মহারাজ বললেন—

' " সহনং সর্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্বকম্।

চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥" (বিবেকচূড়ামণি ২৪) তিতিক্ষা আবশ্যক। শ-ষ-স, যে সয় সেই রয়—যে না সয় সে নাশ হয়।' আমি বললুম, 'ব্রহ্মজ্ঞানে স্থিত হলে তো সব আপনিই সহ্য হয়।' তাতে বললেন, 'প্রথম থেকেই তো আর ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। অভ্যাস করতে হয়।' আমি বললুম যে, 'অনেক লোক এমন আছে যে সব সইতে পারে অথচ ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি, সেরকম সইলে লাভ কি?' মহারাজ বললেন, 'তা নয়, উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ ইত্যাদি। তবে গোড়ায় গোড়ায় সহ্য অভ্যাস করা আবশ্যক, তা না হলে কষ্টের সীমা থাকবে না। Face the brute (নিজের পশুভাবের সম্মুখীন হও), স্বামীজী বলেছিলেন এই কথাটা তাঁর জীবনে অদ্ভুত আলো দিয়েছিল। আমি একবার উজ্জয়িনীতে ছিলাম তখন খুব গরম। দ্বিপ্রহর রৌদ্রে যখন কেউ বেরোয় না আমার হঠাৎ সেই সময়ে বেড়াবার ইচ্ছা হল। আমি বেরোলাম। কিছু দূর গিয়ে পায়ে ফোসকা হল। তবুও চলেছি। হঠাৎ একটা দোকানদার, ভারি ভক্ত, সে ছুটে এসে পায়ে ধরলে—তার দোকানে নিয়ে গেল। সরবৎ খাওয়ালে—যেন কষ্টটা তা-রি হচ্ছিল এমন অনুভব করে আমায় নিয়ে গেল। বাহিরে

বেরোলে যখন কেউ সাহায্য করার থাকে না তখন তিনিই দেখেন। ঠিক ঠিক নিষ্কিঞ্চনভাব এলে তিনি রক্ষা করেন—তাঁর হাত অনুভব হয়।'

২৬শে এপ্রিল ১৯২১

হরি মহারাজ বললেন—'স্বামীজী বলতেন, "ভীষ্ম হচ্ছে মহাভারতের hero (নায়ক)।" ভীষ্মকে বেশী পছন্দ করতেন। আমরা যুধিষ্ঠিরকে বড় মনে ভাবতাম। তিনি বলতেন, "ওটা প্যানপ্যানে। শিব হচ্ছেন মহাভারতের দেবতা।" '

১০ই মে ১৯২১

হরি মহারাজ বললেন—'ঠাকুরের সামনে শশী মহারাজ একখানা নূতন কাপড় জোরে ছিঁড়েছিলেন। ঠাকুর চমকে উঠে বলেছিলেন, "করলি কি? খবরদার করিসনি। এর ভিতর যিনি আছেন তিনি ফোঁস করে উঠে ছুবলে দিবেন। সাবধান।"

১৫ই মে ১৯২১

হরি মহারাজ বললেন—'ঠাকুর একবার একঘর লোকের সামনে শশধর তর্কচূড়ামণিকে দেখে বলেছিলেন, "দেখগো শশধর ভুয়ো পণ্ডিত নয়। যেন একটা বীরাচারী সাধক।" তখন শশধর তর্কচূড়ামণি সজলনয়নে বলেছিলেন, 'মহাশয়, আমি দর্শন পড়ে শুষ্কো হয়ে গেছি। আমায় একটু ভক্তি বিশ্বাস দিন।" ঠাকুর বলেছিলেন, "হবে হবে।" '

'শশধর আরও বলেছিলেন, "মহাশয়, আপনাদের মতো লোকের মুখ দিয়েই বেদ-বেদান্ত বাহির হয়েছিল।" '

হরি মহারাজ বললেন—'ভগবান, ভগবান করে মরে যাওয়াও ভাল, তবু ছাড়া উচিত নয়। চাতক সাতসমুদ্র ভরপুর তবুও "ফটিক জল" "ফটিক জল" বলে চেঁচায়। স্বাতী নক্ষত্রের জলের জন্য অপেক্ষা করছে—অন্য জল খাবে না। বলে অন্য জলে সব ধুলো। ভক্তও ভগবান ছাড়া বিষয়ে মজবে না। আগে তিনি, পরে বিষয়।'

প্রেমানন্দ-প্রসঙ্গ

১৯২৫ সাল, ২৫শে নভেম্বর

শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজের জন্মদিন উপলক্ষে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আমায় বাবুরাম মহারাজের সম্বন্ধে আলোচনা করতে বলায় তাঁর সম্বন্ধে কিছু বললাম। প্রথমে ভূমানন্দ-স্বামী বলেন। তার পর আমি, পরে নির্বেদানন্দ। তৎপরে মহাপুরুষ মহারাজ বলেন। তিনি বললেন, তাঁর চরিত্র বেদাগ। তিনি মঠের মা ছিলেন। শ্রীমতীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে সম্বন্ধ ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সেই সম্বন্ধ ছিল। ঠাকুর বলতেন—'তিনি শ্রীমতীর অংশ।' একবার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় ফেল হবার পর বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরের কাছে গিয়ে বলেন যে 'কিছু ভাল লাগছে না' অর্থাৎ সংসার ভাল লাগছে না। তাই শুনে ঠাকুর রহস্য করে বলেন—'কেন, ফেল হয়েছিস বলে বুঝি?' পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার দরুন তুলসীরাম বাবু (তাঁর দাদা) তাঁকে বিশেষ বকতেন ও মনোব্যাথা দিয়ে বলতেন যে, ধর্মধর্ম করায় এবং অতিরিক্ত ঠাকুরের কাছে যাওয়ায় পড়াশুনা হচ্ছে না। তারপর একদিন বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরের কাছে আছেন এমন সময়ে তুলসীরামবাবু সেখানে হাজির। ঠাকুর তাঁকে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ তোর আয়ান এসেছে।' বাবুরাম মহারাজের দিদির (রামবাবুর মা) সঙ্গে বাবুরাম মহারাজের একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলে তিনি বললেন ঠাকুর বলতেন, 'ওদের দুজনের মধ্যে যেন একটা ইলেকট্রিক তার দিয়ে জোড়া।' (রামবাবুর মাকেও ঠাকুর শ্রীমতীর অংশ বলতেন)। গাজীপুরে যখন স্বামীজী বাবুরাম মহারাজকে তাড়িয়ে দেবার মতলব করেন তখন সহসা খুব ঠাকুরের নিন্দা করেন। তাতে বাবুরাম মহারাজ মর্মাহত হয়ে বিশেষ ক্রন্দন করেন। স্বামীজী

বলেছিলেন, 'তোর ঠাকুর নির্বাণ নিয়েছে। কৈ তোর ঠাকুর?' ইত্যাদি। সেখানে ব্রাহ্মসমাজের অমৃতবাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ কথা শুনে দুঃখিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'নরেন, তুমি কি ওর (পওহারী বাবার) সাদা রঙ দেখে ভুলে গেলে? তিনি (পরমহংসদেব) কি বস্তু ছিলেন, আর ঐ কানাকে দেখে ভুলে গেলে! গুফায় থেকে থেকে ঝুড়িচাপা ঘাস যেমন সাদা হয় তেমনি ওর রঙ হয়েছে' ইত্যাদি। অতঃপর বাবুরাম মহারাজ কাশী যান। সেই রাত্রে ঠাকুর এসে ধ্যান কালে অথবা স্বপ্নাবস্থায় স্বামীজীকে সকরুণ দৃষ্টিতে দেখা দেন। তিনবার ঐরূপ দর্শনের পর স্বামীজী পরদিন প্রাতঃকালে গাজীপুর ত্যাগ করেন। আসবার সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারও করেননি।

ভরত মহারাজের (স্বামী অভয়ানন্দ) নিকট প্রাপ্ত

একদিন পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ পূজা করে ৺গঙ্গাপূজায় যাচ্চেন এমন সময়ে চায়ের টেবিলের সমীপবর্তী হওয়া মাত্র ভরত মহারাজ তাঁকে না দেখে ক্ষণিকের জন্য তাঁর মুখে এক দেবীমূর্তি দেখতে পান এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করেন। ঐ কথা সন্ধ্যার সময় তাঁর গা-হাত টিপতে টিপতে ভরত মহারাজ তাঁকে বলেন। তাতে তিনি একটু হেসে পরে গম্ভীর হয়ে যান। ভরত মহারাজ বলবার ঠিক আগেই বাবুরাম মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ভরত, তুই অমন সময়ে প্রণাম করলি কেন? অন্যদিন তো করসি না।'

ঠাকুর বাবুরাম মহারাজের জন্য সন্দেশ নিয়ে এসে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং কারোর দ্বারা বাবুরাম মহারাজকে ডাকিয়ে এনে তাঁকে নিভৃতে খাওয়াতেন। এই ব্যাপার একদিন পূঃ শরৎ মহারাজ বাবুরাম মহারাজকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন।

স্বামী প্রেমানন্দের দুইটি অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা

The Ramkrishna Mission
Belur P. O. (Howrah)
Dated 24. 4. 1916

পরমস্নেহাস্পদেষু

তোমার চিঠি সময়মত পেয়েছি। লোকমুখে তোমাদের সকল সংবাদ প্রায় পাই সেজন্য আর লিখি না। তোমার উপর কেহই বিরূপ নয়। তবে একটু স্থিরচিত্ত হতে চেষ্টা করিও। ইহার নামই যোগ। গতকল্য মহাবাজ শিবানন্দ স্বামী প্রভৃতি ইটিলির উৎসবে গিয়াছিলেন। তথায় শর্বানন্দের বক্তৃতা হইল। তার ঢাকায় যাবার কথা ছিল কিন্তু ঘটে উঠে নাই। শীঘ্রই রাড়িখালে উৎসব হবে জানাইলে শরদিন্দু প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া যাইও। এদিকে কাঁথিতে উৎসব হয়ে গেল। মঠ হতে চারিজন গিয়াছিল, জ্ঞান, আশু ডাক্তার ইত্যাদি। চারিদিক হতে উৎসবের জন্য আহ্বান আসিতেছে। গরমের জন্য মহারাজ আমায় যেতে নিষেধ করছেন। যখন সাধু হয়েছ তখন বেদান্তভাষ্যাদি খুব পড়া দরকার। এতে আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। সঙ্গে সঙ্গে চাই বিবেক-বৈরাগ্য। সকলকে আপনার করে যদি না নিতে পার তবে গৃহী হওয়া উচিত ছিল। আমি আমার ত্যাগ করাইত সাধুত্ব। ঠাকুরের নাম নিয়ে যদি প্রকৃত সাধু না হতে পারিলে তবে তোমাদের জীবন বৃথা। যে লোক এই জীবন্ত জীবের মধ্যে শিবত্ব দেখিতে চেষ্টা না করে তাহার সাধুর ভেক পরা বিড়ম্বনা মাত্র। সে আপনিও ঠকচে আর সংসারকেও ঠকাচ্ছে। কেবল lecture ব্যাখ্যা বক্তৃতা দিলেই কি বড় সাধু হল? তবে আর স্বামীজী ও ঠাকুরের জীবনে তোরা শিখলি কি? ভালবাস, নিঃস্বার্থরূপে জীবজগৎকে ভালবাস। ছেড়ে দাও ক্ষুদ্র আপনাকে, অতি হীন আমিত্বকে। ধর এই অদ্ভুত অপরূপ আশ্চর্য আদর্শকে—

এমনটি আর হয় নাই। সার্থক কর জীবন, ছেড়ে দে আপন। আমাদের ভালবাসা চারুকে জানাবে ও সকলে জানিবে। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী প্রেমানন্দ

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

Ramkrishna Math
Belur Math, (Howrah)
26. 6. 1915.

কল্যাণবরেষু

ললিত কদিন হলো তোমার এক post card পেয়েছি। তোমরা নিষ্কামভাবে কত অনাথ দরিদ্র নারায়ণের সেবা করতে পেয়ে ধন্য হচ্ছ। পূজ্যপাদ স্বামীজী বলতেন তোমাদের চিত্তশুদ্ধি করবার জন্য ঐ সব দরিদ্র নারায়ণ কঙ্কালসাররূপ মুখোস পরে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছেন। মনে করো না তোমরা তাদের উপকার করছো, পরন্তু তোমরাই উপকৃত হচ্ছ জানিবে। ভিতরে ভাব থাকা চাই। নইলে অভিমান এসে পতনের আশঙ্কা আছে। এ তোমাদের একটা মহা সাধন হচ্ছে—তপস্যা হচ্ছে। কিন্তু খুঁটি ছেড়ো না। সর্বদা ঠাকুর ও স্বামীজীকে স্মরণ করবে। দক্ষিণেশ্বরে যে শক্তি প্রভুর মধ্যে বিকশিত হয়েছিল, স্বামীজীর মধ্যেও সেই শক্তি প্রবেশ করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এসেছিল। এই নিষ্কাম কর্ম দ্বারাই বুঝতে পারবে তোমাদের কত কল্যাণ হচ্ছে, কত ভক্তি শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে।

তোমাদের এই বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারীদের আদর্শ ত্যাগী, আদর্শ সংযমী, আদর্শ ভক্ত হতে হবে। মহা কঠোর সাধন চাই। নতুবা গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ালে ভক্তি বিশ্বাস আসা অসম্ভব। অভিমান, অহংকার, দম্ভ, দর্প একেবারে দূর করতে হবে। প্রাণ থেকে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করবে। প্রভুর আশ্রয়ে যখন এসে পড়েছ তখন

তোমাদের ভয় নেই, শঙ্কা নেই। বিশ্বাস কর প্রভু আমাদের অন্তর বাহির সব দেখতে পাচ্ছেন। তাঁকে ফাঁকি দেবার যো নেই। খুব ভক্তি বিশ্বাস হোক এই আমার শ্রীশ্রীপ্রভুর চরণে নিয়ত প্রার্থনা। মানুষ হয়ে যাও, দেবতা হয়ে যাও। এই চাই—এই চাই। তোমরা সকলে আমাদের আন্তরিক ভালবাসা জানবে ও উমানন্দ প্রভৃতিকে জানাবে। আমি ভাল আছি। তোমরা কেমন আছ মাঝে মাঝে লিখবে। ইতি।

শুভানুধ্যায়ী প্রেমানন্দ

সারদানন্দ-প্রসঙ্গ

২৬শে এপ্রিল ১৯২৫

আজ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মুক্তেশ্বরানন্দের (ঈশ্বরের) অভিষেক হইল। তাহার পূর্ণাভিষেকের ব্যাপারে প্রশ্নাদিক্রমে কথা উঠিল, তাহাতে ক্রমে মহারাজ বলিলেন, 'ঠাকুরের ইচ্ছা হয়েছিল যে (রাখাল) মহারাজের জন্য বিধিপূর্বক অভিষেকের অনুষ্ঠান করবেন। কিন্তু মা ঠাকরুনকে জিজ্ঞাসা করায় মা বলেছিলেন—"তোমার সংকল্পমাত্রে কাজ হয়, তোমায় আর অত অনুষ্ঠান করতে হবে কেন?" তাতে ঠাকুর মহারাজের জন্য মনে মনে সমস্ত অনুষ্ঠান করেছিলেন।'

মহারাজ বলিলেন, 'দীক্ষা নিয়ে ভগবানের চিন্তা করতে করতে ক্রমে ভিতর খুলে গেলে তখন মানুষ আপনিই নিজের ভাব অনুসারে এগিয়ে যেতে থাকে। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে শ্রীভগবানের যে একটা একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে (মাতৃভাবে, সখ্যভাবে, দাস্যভাবে) মানুষ নিজেই সেটা বুঝতে পারে এবং নিজ ভাব অবলম্বনে তাঁর দিকে এগুতে থাকে। দীক্ষাদি প্রথম অবস্থায় খানিকটা এগুবার সহায়তা করে মাত্র। [তিনি ধ্যান করতে বসবেন। এই সময় বেলা ৮টা বাজে, এসব কথা হল। ত্রিপুরার (ত্রিপুরসুন্দরীর) কামবীজ আর তারার স্ত্রী বীজ ইত্যাদি কথাও হল।]

মহারাজ বলিলেন, 'যেদিন স্বামীজী প্রথম মা কালীকে মেনে-ছিলেন ঠাকুর তাঁকে নিয়ে সেদিন চক্র করেছিলেন। ঠাকুর নিজে শক্তি হয়েছিলেন।'

১লা মে ১৯২৫

পূজনীয় শরৎ মহারাজ বলিলেন, 'বিশ্বাস ও দর্শন একই কথা। সাধারণতঃ ধ্যানে দর্শনাদি হয় যাদের psychic nature (অন্তর্মুখীন স্বভাব)। এটা হলেই যে বড় একটা কিছু হল তা নয়। ঐ রকম

কারও কারও একটু বেশী হয়। ঐ রকম না হলেও, অর্থাৎ রূপাদি দর্শন না হলেও কারও কারও ঈশ্বরের সান্নিধ্যমাত্র অনুভব হয়। ভাব উপলব্ধি হয়। তবে যে দর্শনে কথাবার্তা হয় সে রকম দর্শন কজনের হয়। ক্বচিৎ কারও হয়—সে অতি বিরল। দেখতে হবে ভগবৎ চিন্তা করে যদি দিন দিন বিষয়ে বৈরাগ্য হয়, চরিত্র গঠিত হয়, ভোগে লিপ্সা কমে যায়, তবেই উন্নতি হচ্ছে বোঝা যাবে। আর দর্শনাদি হচ্ছে অথচ ত্যাগ তপস্যা বাড়ছে না, সংযম হচ্ছে না, তাহলে বুঝবে কিছুই হচ্ছে না। শ্রীচৈতন্যদেব যে প্রেমের ধর্ম প্রচার করলেন কটা লোক তা ধারণা করতে পারলে! তাঁদের সে অদ্ভুত ত্যাগ-বৈরাগ্যের উপর যে প্রেম-ধর্ম প্রতিষ্ঠিত তা সাধারণ লোক নিতেও পারলে না, ধারণাও করতে পারলে না। তার ফলে একটা যা তা ধর্ম নিয়ে সমাজে চালালে।'

দশ মহাবিদ্যায় যে রূপাদি দৃষ্ট হয় সেগুলো যথার্থ ঐ রকম অথবা রূপকমাত্র এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামী সারদানন্দ বলেছিলেন—'দুই-ই বটে অর্থাৎ যেমন যেমন মূর্তি দৃষ্ট হয় সে রকম ঈশ্বরীয় মূর্তি আছে। আবার রূপকও বটে। ঠাকুর দুই-ই মানতেন। যিনি এতরূপ করেছেন তিনি নিজে আর একটা রূপ ধারণ করবেন এ আর বিচিত্র কি?'

শ্রীম-প্রসঙ্গ

১৮ই অক্টোবর ১৯২১

মাস্টার মশাই বলিলেন—'ঠাকুর ভক্তদের আগমন প্রতীক্ষা করতেন। সেজন্য নৌকায় কে এল না এল দেখতেন।'

'লাটু মহারাজকে বকেছিলেন কারণ তিনি বেশী বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকেতেন এবং বলেছিলেন, সকালে উঠে ধ্যানজপ করে তারপর বরং আবার একটু শুতে পারে।'

'ঠাকুরের কাছে একটি স্ত্রী ভক্তের প্রশংসা শুনে অনেক ভক্তেরা তাঁর কাছে যেতেন। কিন্তু ঠাকুর রাখাল মহারাজকে এজন্য তিরস্কার করেছিলেন এবং যেতে নিষেধ করেছিলেন।'

'স্বামীজী অন্নদা গুহদের কাছে যাতায়াত করতেন বলে ঠাকুর বলেছিলেন--

"যার আছে কানে সোনা তার কথা আনা আনা
যার আছে পোঁদে ট্যানা তার কথা কেউ শোনে না।" '

'ঠাকুর মথুরবাবুদের বাড়িতে জানবাজারে কয়েকদিন ছিলেন। হঠাৎ একদিন রাত্রে বললেন, "আমি দক্ষিণেশ্বরে যাব।" তারপর সেই রাত্রেই গাড়ি করে দক্ষিণেশ্বরে এসেই বললেন, "মা আমি এসেছি।" ঠাকুরের রাত্রে ভাল ঘুম হত না; উঠে পায়চারি করতেন। একদিন গভীর রাত্রে বললেন, "এই সময়ে অনাহত ধ্বনি শোনা যায়।" '

মাস্টার মশাই বলিলেন,—'ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, "অমুককে বোলো আমাকে চিন্তা করলেই হবে" এতে indirectly (পরোক্ষভাবে) আমাকেই (মাস্টার মশাইকে) বলা হয়। বলতেন "বৈধী ভক্তি ভক্তিই নয়।" "শীগ্‌গীর সব করে নাও কখন দেহ যায় কে জানে" অধর সেনকে ঐ কথা বলেছিলেন।'

'বিষয়ীর গায়ের হাওয়া যাতে না লাগে (ঠাকুর) এজন্য মোটা চাদর গায়ে দিয়ে থাকতেন।'

'অবতারপুরুষের মুখ দিয়ে ভগবান indirectly (পরোক্ষভাবে) কথা বলেন। শ্যামপুকুরের বাটীতে কালীপূজার আয়োজন হলে

সেই দ্রব্যাদি নিয়ে গিরিশ প্রমুখ ভক্তেরা ঠাকুরের পূজা করেন। এতে ঠাকুর বরাভয় মূর্তি প্রকাশ করেন।'

'বাবুরাম মহারাজকে ছুঁয়ে ঠাকুরের সমাধি হয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন, "এখন আমি সব বলতে পারি কে কতদূর এগিয়েছে" ইত্যাদি।'

'প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় ঠাকুর বলতেন, "আমি ঘর তুমি ঘরণী, মা, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী।" '

'ঝামাপুকুরে থাকতে ঠাকুর প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে ঠনঠনের কালীবাড়িতে আসতেন এবং অনেকক্ষণ ধরে ধ্যানজপ করতেন।'

'কাম, ক্রোধ সকলের প্রকৃতিতেই আছে কিন্তু সাধারণ লোকেরা তার বশবর্তী হয়ে পড়ে। অনেকে ঠিক প্রতিকার না জেনে বৃথা চেষ্টা করে। ঈশ্বরচিন্তাই খাঁটি প্রতিকারের উপায় তা ভুলে যায়।'

'বিষয়ী লোক অথবা বড়লোকদের ভালবাসলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

'গায়ত্রী মন্ত্রে অন্তর ও বাহির উভয় প্রকৃতিতেই প্রেরণা সঞ্চার করে। "ধিয়ো" ইত্যাদি অথচ বহিঃ প্রকৃতিতে প্রেরণা আছে যথা "ভূর্ভুবঃ স্বঃ"।'

'সাধুসঙ্গ সকলেরই আবশ্যক। সাধুরও প্রয়োজন এবং গৃহস্থেরও প্রয়োজন।'

'প্রথম ক্যানসারের সূত্রপাতের সময় ঠাকুর নিরঞ্জন মহারাজকে বকেছিলেন কারণ নিরঞ্জন মহারাজ ঠাকুরের জন্য আম কিনতে চেয়ে ছিলেন। একটি ভক্ত জপ করতেন, ছোলা দিয়ে সংখ্যা রাখতেন। তাই ঠাকুর তাঁকে বললেন, "ছোলা এনে দিও আমি ব্যঞ্জন রেঁধে খাব।" '

'ঈশান মুখুয্যে ঘর বেঁধেছিল পুরশ্চরণ করার জন্য। শুনে ঠাকুর বললেন, "সে কি গো, এত লোককে জানিয়ে ভগবানকে ডাকবে?" '

'কালীপূজার দিন ঠাকুরের দেহে খুব পুলকাদি হচ্ছে। তাই

দেখে তিনি নিজেই বললেন, "দেখগো চারিদিকে লোকে ভগবানকে ডাকছে কিনা তাই এমন হচ্ছে।" মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে রথটানার সময় রাজা প্রতাপরুদ্রর দেখা হল। রাজা "তব কথামৃতং" ইত্যাদি বলেছিলেন। তিনি দীন বেশে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখে "ভূরিদা জনাঃ" পর্যন্ত শুনেই প্রভু ভাবে ক্রমাগত "ভূরিদা" "ভূরিদা" বলেছিলেন, আর রাজাকে আলিঙ্গন করেছিলেন।'

'মঘা, অশ্লেষা, সংক্রান্তি এসব ঠাকুর মানতেন। একবার একটি ভক্ত ১লা তারিখে তাঁর সঙ্গে দেখা করে অন্যত্র যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, "সে কি গো, আজ অগস্ত্য যাত্রা, যেতে নেই বলে। তবে কে জানে বাবু।" কে জানে বাবু অর্থাৎ তাঁকে দেখে যাচ্ছে কি না তাই দোষ তত হবে না। আর একবার মঘায় রাখাল মহারাজের জন্য একখানি ক্যাম্পখাট তৈরি হয়ে এসেছিল। ঠাকুর সেটি ফিরিয়ে দিলেন, যাত্রা বদলে আনলেন। বললেন "ঐটার দিকে দেখলে মনে হয় যেন হাঁ করে রয়েছে। যেন খেতে আসছে।" '

'যিনি শরীর রক্ষার জন্য মায়ের স্তনে দুধ দিয়েছেন, তিনিই আমার আত্মার কল্যাণের জন্য ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সাধু, শাস্ত্র, মন্দির ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছেন।'—এটি দ্বিতীয় দর্শনের দিন ঠাকুর মাস্টার মশাইকে বলেছিলেন। সন্ধ্যার সময় সকল কাজ ছেড়ে তাঁকে ডাকতে বলেছিলেন।

'বিজয় গোস্বামীকে বলেছিলেন, "তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, তিনিই সব জানিয়ে দেবেন তিনি কেমন। অত তোমার হিসাবে দরকার কি তিনি সাকার কি নিরাকার?" '

১০ই অক্টোবর ১৯২৫

'ঠাকুরের মুখ দিয়ে কখন কখন আপনি আপনি বীজমন্ত্র বেরোত। তিনি ভাবে unconsciously (অজ্ঞাতভাবে) উচ্চারণ করতেন। একবার একটি মন্ত্র তাঁকে উচ্চারণ করতে মহাপুরুষজী শুনেছিলেন।'

পরিশিষ্ট

১

স্বামী কমলেশ্বরানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণচরণে সমর্পিতপ্রাণ ত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁহার মধ্যে পাণ্ডিত্য ও ঈশ্বরানুরাগ, বৈরাগ্য ও প্রেম, জ্ঞান ও কর্ম, বৈদিক যাগযজ্ঞ ও তান্ত্রিক পূজানুষ্ঠান এবং শ্রদ্ধাভক্তি ও মধুরভাবের মিলন ঘটিয়াছিল।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দের পূর্বাশ্রমে নাম ছিল শ্রীললিতমোহন বসু। ইংরাজী ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী কলিকাতায় ভবানীপুর পল্লীতে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা অক্ষয়কুমার বসু ও মাতা মৃণালিনী দেবীর তিনি পঞ্চম সন্তান। তাঁহারা পাঁচ ভ্রাতা ও পাঁচ ভগ্নী। তন্মধ্যে তৃতীয় ভ্রাতা প্রমথনাথ বসু বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ছিলেন। বাংলাভাষায় তিনিই প্রথম স্বামী বিবেকানন্দের একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত রচনা করেন।

শৈশব হইতেই ললিতমোহনের মধ্যে দেবদেবীর পূজায় অনুরাগ দেখা গিয়াছিল। তিনি ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কলেজে পাঠকালে তাঁহার মনে ঈশ্বরলাভ করিবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা জন্মে এবং সাংসারিক জীবনের প্রতি ক্রমেই তিনি বীতস্পৃহ হইয়া ওঠেন। এইখানেই তাঁহার কলেজ-জীবনের অবসান ঘটে। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি গভীর নিষ্ঠার সহিত দর্শন-শাস্ত্রাদি পাঠ করেন। একসময় তৎকালীন প্রখ্যাত পণ্ডিতপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট শিক্ষালাভ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল।

সাধকজীবনের প্রথমদিকে শ্রীশ্রীনারদবাবা (বালানন্দ ব্রহ্মচারী) নামক শাস্ত্রবিদ্ যোগীশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের নিকট তিনি সাধনপ্রণালী শিক্ষা করেন। পরে ক্রমশঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় আকৃষ্ট হন ও বেলুড় মঠে যাতায়াত শুরু করেন। এই সময় শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব গড়িয়া ওঠে। তাঁহারা উভয়েই তখন একই পথের পথিক! দুই বন্ধুতে মিলিয়া একত্রে মঠে যাতায়াত করিতেন যদিও পরবর্তী কালে দুইজনের জীবন দুই বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল।

একবার তিনি তীর্থ করিতে চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে যান। ফিরিয়া আসিলে মঠে শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'কোথায় এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? আসবি তো এখানে চলে আয় না?' উদ্বোধনে মায়ের বাড়িতে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনলাভের সৌভাগ্য এই সময় তাঁহার হইয়াছিল। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' নামক পুস্তকে জনৈকা প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তমহিলা মায়ের সহিত এইরূপ একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়াছেন যাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"ললিত পনের-ষোল বৎসরের বালকমাত্র; যে মহাশক্তি বালকের ছদ্মবেশে আবরিত হইয়া নামরূপ উপাধি ধারণ করিয়াছে যেন সেই মহাশক্তি এখন বিকাশোন্মুখ। দিব্য শ্যামবর্ণ সুগঠন তাহার চেহারা। চক্ষু দুটি ভক্তিরসে সর্বদা ঢুলু ঢুলু। ভিতরে ভগবদ্ভক্তিরূপ সুধাস্রোত প্রবাহিত যেন কানায় কানায় পূর্ণ। বাহিরেও সেইরূপ অনুরাগ প্রতিভাত হইতেছে।

"ললিত আসিয়াই একেবারে মায়ের শ্রীচরণে মাথা রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পড়িল এবং নিতান্ত আর্তস্বরে দর্শকবৃন্দকে আকুলিত করিয়া অজস্র অশ্রুধারায় ভাসিয়া মায়ের চরণে প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। 'মা দয়াময়ী গো, দয়া করুন। মাগো আপনি এই জগৎ উদ্ধার করতে এসেছেন। আমাকেও টেনে নিন্ মা। আমি আপনার চরণ ছাড়ব না। আমাকে পায়ে স্থান দিতেই হবে।"

অবশেষে বাইশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া ললিত মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে যোগদান করেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ করেন এবং তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা পান। পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট তিনি ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণমঠে তিনি প্রথমে ব্রহ্মচারী পূর্ণচৈতন্য এবং পরে স্বামী কমলেশ্বরানন্দ নামে পরিচিত হন। উত্তরকালে গদাধর আশ্রমে অধ্যক্ষতাকালে পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে পূর্ণাভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসজীবনের প্রারম্ভে বেলুড় মঠে ও কাশীতে তিনি পূজ্যপাদ রাজা মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, শরৎ মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ ও হরি মহারাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহাদের অকুণ্ঠ স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভ করেন। এইসব মহাপুরুষগণের শিক্ষা ও সান্নিধ্যে তাঁহার ধর্মজীবন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি পরবর্তিজীবনে তাঁহার শিষ্য ও ভক্তদের প্রায়ই বলিতেন, "দেখ, একখানা খাঁড়াই যথেষ্ট, আর আমার উপর ওরকম সাতখানা খাঁড়া পড়েছিল। তোরা ভাবছিস কি?"

সাধুজীবনের সূচনায় ১৯১৫ সালে ত্রিপুরায় দুর্ভিক্ষ রিলিফের কাজে দরিদ্রনারায়ণ-সেবার জন্য মঠ হইতে কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারীদের পাঠান হয়। তন্মধ্যে স্বামী ভূমানন্দ, কমলেশ্বরানন্দ, বাসুদেবানন্দ, মুক্তেশ্বরানন্দ প্রভৃতি ছিলেন। আর একবার পূর্ববঙ্গে ঢাকায় তাঁহাকে পাঠান হইয়াছিল।

অনুমান ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি বেলুড় মঠের অন্তর্গত ভবানীপুর গদাধর আশ্রমে অধ্যক্ষরূপে প্রেরিত হন এবং জীবনের শেষ চতুর্দশ বৎসর ঐ কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া তথায় এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ গড়িয়া তোলেন। সর্বদা পূজাপাঠ, হোম, উৎসব, ঠাকুরসেবা, সাধু-সেবা, শাস্ত্রালোচনা, ভজন ইত্যাদিতে গদাধর আশ্রম আনন্দমুখর হইয়া থাকিত। ধর্মপিপাসু ভক্তগণ তাঁহার নিকট ধর্মোপদেশ ও সাধনমার্গের নির্দেশ পাইয়া শান্তিলাভ করিতেন। কথামৃতকার

পূজনীয় মাস্টার মহাশয় স্বামী কমলেশ্বরানন্দকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার বিশেষ অনুরোধে গদাধর আশ্রমে আসিয়া প্রায়ই থাকিতেন। ১৯২৩ সালের শেষের দিকে ললিত মহারাজ কিছুদিন যাবৎ সারারাত্রি ধরিয়া কালীপূজা করিতেন। হোমের পূর্ণাহুতি হইত রাত্রিশেষে ব্রাহ্মমুহূর্তে। তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণ সকলের হৃদয় পবিত্রভাবে পূর্ণ করিত।

বৈদিক যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের উপর তাঁহার প্রবল অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত এবং রামকৃষ্ণমঠের সন্ন্যাসীদের লইয়া তিনি বহুবার রুদ্রযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতিতেও তিনি বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন। গীতা, উপনিষৎ, তন্ত্রশাস্ত্র, ও শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য ছিল এবং শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যায় তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিতেন। সাধুজীবনের প্রথম দিকে ১৯২০-২১ সালে কাশীতে পূজনীয় হরি মহারাজকে নিত্য শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিয়া শোনান তাঁহার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। শ্রীমদ্‌-ভাগবত পাঠের অবসর কালে তাঁহার সহিত ললিত মহারাজের ধর্ম-প্রসঙ্গে নানা আলোচনা চলিত। বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত 'তুরীয়ানন্দ-প্রসঙ্গ' অধ্যায়টি তাহারই আংশিক ফলশ্রুতি। তাঁহার পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া পূজনীয় হরি মহারাজ তাঁহাকে এই সময় বলিয়াছিলেন, 'ওরা তো আমার শরীরের সেবা করে। কিন্তু তুমি আমার আত্মার সেবা করছ। কত আনন্দ হচ্ছে।' গদাধর আশ্রমেও তিনি নিয়মিত শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। জীবনের শেষদিকে উদ্বোধনে তিনি দুই বৎসর যাবৎ প্রতি রবিবার শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

বাংলাদেশে বেদাধ্যয়ন ও বেদচর্চার প্রচলন করা স্বামীজীর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ছিল। তদুদ্দেশ্যে কমলেশ্বরানন্দজী গদাধর আশ্রমে 'শ্রীরামকৃষ্ণ বেদবিদ্যালয়' স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে বেদ উপনিষদ্, ন্যায়, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়নের তিনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বিখ্যাত দার্শনিক ও পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় এই বিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন। ইহার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য তাঁহাকে (মহারাজকে) কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত।

বেদচর্চার প্রসারকল্পে স্বামী কমলেশ্বরানন্দ সায়নভাষ্যসমেত স্বাধ্যায় প্রশংসা, নাসদীয় সূক্ত, হিরণ্যগর্ভসূক্ত প্রভৃতি বেদাংশ সংকলন করেন ও বঙ্গানুবাদসহ 'শ্রুতিসংগ্রহঃ' নামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। বৈদিক দেবতা রুদ্র বিষয়ে বেদ হইতে সংগৃহীত 'রুদ্রাধ্যায়' শীর্ষক তাঁহার অপর একখানি পুস্তক অনুবাদসহ তাঁহার দেহত্যাগের অল্পদিন পরে তাঁহার বিশিষ্ট ভক্ত ও শিষ্য শ্রীমানসপ্রসূন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন ধারার সমন্বয়পূর্ণ উদার মতবাদে কমলেশ্বরানন্দজী আন্তরিক বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে ইহা প্রতিফলিত হইত। তাই তাঁহাকে দেখি কখনও দুরূহ শাস্ত্রবিচারে মগ্ন, কখনও বা ভজন ও সঙ্গীতে আত্মহারা। কখনও ধ্যানজপাদি তপস্যা, কখনও সাধুসঙ্গ ও শরণাগতি, কখনও আশ্রমপরিচালনা ও ভক্তগণকে শিক্ষাদান প্রভৃতি বিভিন্ন সাধনযজ্ঞ তাঁহার জীবনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

অন্যধর্মের প্রতিও তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বিশপস্ কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল এবং কঠোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদক রেভারেণ্ড পেলী সাহেবের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্র গড়িয়া ওঠে। একবার বিশপস্ কলেজে কঠোপনিষদের অভিনয় দেখিতে পূজনীয় মাস্টার মহাশয়ের সহিত কমলেশ্বরানন্দজী প্রভৃতি গিয়াছিলেন।

কঠোর সাধনা ও গভীর ঈশ্বরচিন্তার ফলে স্বামী কমলেশ্বরানন্দ অনেক সময় ভাবাবস্থায় থাকিতেন। ফলে তাঁহার বাহিরের আচরণ মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক মনে হইত। এমন কি কেহ কেহ তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ ভাবিতেন। পূজনীয় মাস্টার মহাশয় দীর্ঘ দিন তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখিয়াছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'বেশী

ঈশ্বরচিন্তা করে করে ওরকম হয়। কি খাটুনি—সারারাত জেগে পূজো করছে দিনের পর দিন। তারপর মঠ চালনার জন্য টাকা তোলার চেষ্টা রয়েছে। এরূপ হওয়া ত আশ্চর্য কিছু নয়। ব্যাকুল হলেই nerve excited হয়ে যায়। অন্যকারণে অন্যরকম হয়। বিষয়চিন্তা করে উন্মাদ ও ঈশ্বরচিন্তা করে উন্মাদ আলাদা জিনিস। লোকে ঐ রকম বলে থাকে। ঠাকুরকেই বলতে ছাড়ত না। আমাদের মনে হয়, এটা তা নয়। ঈশ্বরচিন্তা বেশী করলে বায়ুবৃদ্ধি হয়। ঠাকুর বলতেন তখন মিছরির পানা খেতে হয়। আর বাদাম তেল মাখতে হয়। আর কথা কয়ে tired হলে একটু ঘুমুতে বলতেন। সামান্য ঘুমেতেই ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।'

উনিশ দিন জ্বরভোগের পর ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে দুর্গাপূজাবসানে মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে স্বামী কমলেশ্বরানন্দ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার গম্ভীর ব্যক্তিত্ব, অথচ সুমিষ্ট ব্যবহার ও স্নেহ-ভালবাসা এবং সর্বোপরি ভগবৎপ্রেম সকলকে মুগ্ধ করিত।

পরিশিষ্ট

২

স্মৃতির অর্ঘ্য

শ্রীতারকনাথ মজুমদার

প্রারম্ভে মদীয় গুরুদেব পূজ্যপাদ স্বামী কমলেশ্বরানন্দকে স্মরণ করি। তাঁকে আমার শতকোটি প্রণাম জানাই।

তাঁর অপার স্নেহ, অপার কৃপা কি ভাবে, কত প্রকারে শিষ্য ও আশ্রিতদের উপর বর্ষিত হত, তাদের ছোটখাট সুখ দুঃখ দেখামাত্র তিনি কিভাবে বুঝে নিতেন, দুঃখ বেদনা নিবারণ করতেন কতভাবে তা যাঁরা তাঁর কৃপা পেয়েছেন তাঁরা বুঝেছেন, মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছেন।

আমার তখন কিশোর বয়স। তাঁর মধুর ভাব, ঈশ্বরীয় ভাব, উপদেশ ও শাসন কতটাই বা তখন উপলব্ধি করতে পেরেছি। তাঁর সঙ্গলাভকালীন কয়েকটি ঘটনা ও সামান্য কিছু বিবরণ আমি এস্থলে লিপিবদ্ধ করছি।

মনে পড়ে আমরা দুইবন্ধু একদিন ভবানীপুরের গদাধর আশ্রমস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ বেদবিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়বার জন্য উপস্থিত হই (ইং ১৯২৬-৭)। যাওয়ামাত্র ললিত মহারাজের (স্বামী কমলেশ্বরানন্দ) সাক্ষাৎ পেলাম। মনের কথা জানালাম। খুব খুশী হলেন তিনি। বললেন, 'রোজ সকাল ৬টায় আমার গীতা ক্লাসে এস। তারপর সব হবে।' এরূপ নির্দেশ পেয়ে আমরা গীতা ক্লাসে যোগ দিলাম। আশ্রমের ব্রহ্মচারিগণ, কয়েকজন প্রবীণ ভক্ত ও আমরা কয়জন ছিলাম তাঁর গীতা ক্লাসের ছাত্র।

একদিনের ঘটনা বলি। গেছি গদাধর আশ্রমে, বেলা তখন আন্দাজ ৩টা। গিয়ে দেখি দোতলার ঘরটিতে অনেক ভক্ত বসে

আছেন তাঁকে ঘিরে। তিনি তখন দিব্যভাবে বিরাজ করছেন —কখনও উচ্চ হাস্য, কখনও চুপচাপ, আবার কখনও বা নানা ভাবে ঠাকুরের কথা বলছেন। আনন্দের স্রোত বইছে। এমন সময় জনৈক ব্রহ্মচারী অতি সন্তর্পণে তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে দিলেন এক গেলাস পানীয়—দুধের সর মিশ্রিত ডাবের জল। তাঁর তখনকার শরীর মনের অবস্থা বুঝে কবিরাজ মশাই নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রত্যহ খাবার জন্য। গেলাসটা হাতে নেবার পর হঠাৎ তিনি আমাকে ডাকলেন, 'আয়, এটা খেয়ে নে।' কবিরাজ মশাই উপস্থিত ছিলেন। তিনি এবং সব ভক্তরা সমস্বরে বলে উঠলেন, 'সে কি! আপনি খান। ওটা আপনার ওষুধ। ওকে দেবেন কেন?' আমারও আপত্তি। আমি খুব ইতস্ততঃ করছি। কিন্তু সকলের উপরোধ উপেক্ষা ক'রে তিনি ঐ পানীয় আমাকেই খাওয়ালেন। মায়েরা যেমন ছোট ছেলেকে খাওয়ায় ঠিক সেইভাবে —তাঁর এক হাত আমার গ্রীবাসন্ধিতে আর এক হাত গেলাসে। সবটা আমাকে খাইয়ে তিনি সন্তুষ্ট হলেন। তন্মুহূর্তে তাঁর ভিতর মাতৃভাবের প্রকাশ হয়েছিল যা মনে পড়লে আজও আমার শিহরন জাগে।

একদিন গুরুদেবের কাছে বসে আছি—এলেন পুরুলিয়ার এক জমিদার-শিষ্য। তাঁর বিশেষ আকুতি এই যে, গুরুদেবকে তিনি ভাল ধুতি ও পাঞ্জাবী উপহার দেবেন। শিষ্যটির কথা শোনা মাত্র গুরুদেব আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'ওকে আগে দে তারপর আমায় দিবি।' আমি তো বিস্ময়ে নির্বাক্ হয়ে বসে রইলাম। বস্তুতঃ ঐ সময় আমার জামা-কাপড়ের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

একদিন জনৈক ভক্ত গুরুদেবের ঘরে এসে প্রণাম করতে উদ্যত হ'লে তিনি জানতে চাইলেন সে ঠাকুরঘরে প্রণাম করে এসেছে কি না। শ্রীশ্রীঠাকুরকে সে প্রণাম করে আসেনি শুনে তাকে

তিরস্কার করলেন, 'মঠে এলে, ঠাকুরকে প্রণাম না ক'রে আমাদের প্রণাম করতে এস না।'

লোককে বেদান্ত শিক্ষা দেবার জন্য তাঁর কত আগ্রহ ও উৎসাহ তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। গদাধর আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদবিদ্যালয় স্থাপনা ও পরিচালনার জন্য তিনি প্রভূত ত্যাগস্বীকার এবং পরিশ্রম করতেন। ঐ কাজে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। সকালে প্রত্যহ গীতা ক্লাস নিতেন। পরে নির্দিষ্ট ও নিয়মিত সময়ে পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন বিষয়, ব্যাকরণ, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। ঐ সময়টা পুজা পাঠের দিক দিয়ে গদাধর আশ্রম খুব 'জেগে' উঠেছিল। আশ্রম থেকে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে সানগর পল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরিষদ্ স্থাপিত হয়েছিল। সপ্তাহে একদিন (ইং ১৯২৮-৩০ সাল) গুরুদেব পরিষদে হেঁটে যেতেন, উপনিষদের ক্লাস নেবার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ পরিষদের তিনি স্থায়ী সভাপতি ছিলেন। প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্। পরবর্তিকালে চিন্তাহরণ মহারাজ (স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ) ও হরিহর মহারাজ (স্বামী বাসুদেবানন্দ) ক্লাস নিতেন মনে আছে।

জ্যোতিষবাবুকে (মেজর জে. সি. ব্যানার্জি) পরিষদের স্থায়ী সম্পাদক করা হয়েছিল। এঁরই উৎসাহে ও উদ্যোগে সানগরে পর পর তিন বৎসর বাৎসরিক ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম বৎসরের ধর্মসভায় সভাপতি হয়েছিলেন ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্। বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন যথাক্রমে ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া ও ওয়াহেদ হোসেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন বিশপস্ কলেজের সহাধ্যক্ষ রেভাঃ পেলী। বেলুড় মঠ থেকে এসেছিলেন স্বামী শ্রীবাসানন্দ।

এখন একটি ঘটনার কথা সংক্ষেপে বলব যা আমার জীবনকে খুব প্রভাবিত করেছে। একদিন সকালে (সম্ভবতঃ ইং১৯৩৩ সাল) সানগরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরিষদের দাতব্য চিকিৎসালয়ে আমি রোগীদের

ওষুধ দিতে খুব ব্যস্ত আছি, এমন সময় মহাপুরুষ মহারাজের শিষ্য দুর্গাবাবু (৺দুর্গানাথ দে, ইনি নিকটেই থাকতেন) হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসে হাজির—'শীঘ্র এস। ললিত মহারাজ আমার বাড়িতে এসেছেন। অপূর্ব ভাবাবস্থায় রয়েছেন। বালকের মতন সকলের সঙ্গে আনন্দ করছেন। "তারক, তারক" বলে তোমায় ডাকছেন। এখনি চলে এস।' দুর্গাবাবুর বার্তা শুনে আমাদের যিনি প্রধান চিকিৎসক, মহাপুরুষ মহারাজের শিষ্য পঞ্চুবাবু (৺ নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়), তিনি তো লাফিয়ে উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে। কি আনন্দ তাঁর! 'চল, চল, শীঘ্র চল। এই অবস্থা কিছুদিন ধরে মাঝে মাঝে হচ্ছে ললিত মহারাজের। এ এক অপূর্ব সুযোগ তাঁকে স্পর্শ করে ধন্য হবার।' আমরা খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলাম দুর্গাবাবুর বাড়িতে।

আমাকে দেখেই ললিত মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কি মহাপুরুষজীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিস?' আমি বললাম, 'না'। আমার উত্তর শুনে তিনি আদেশ করলেন, 'কালই আয় গদাধর আশ্রমে। দীক্ষা নিবি।' ঠিক ঐ সময় পরিষদের অন্যতম সদস্য হরেন-দা (৺হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) উপস্থিত ছিলেন। এঁর বহুদিন যাবৎ ইচ্ছা ছিল দীক্ষা নেবার। ইতঃপূর্বে চেষ্টাও করেছিলেন কয়েকবার কিন্তু সফলকাম হননি। পঞ্চুবাবু, দুর্গাবাবু ও উপস্থিত অন্যান্য ভক্তদের বিশেষ আগ্রহে হরেনদারও দীক্ষার ব্যবস্থা হল। দীক্ষা নেবার সময় দুজনে দুটি পদ্মফুল নিয়ে হাজির হব, এই আদেশ দিলেন ললিত মহারাজ। পদ্মফুল ঐ সময় দুষ্প্রাপ্য শুনে তিনি বলেছিলেন, 'দ্যাখ, কষ্ট করলে কেষ্ট পাওয়া যায় আর তোরা দুটো পদ্মফুল পাবি না, এ হতে পারে না। বাজারে খোঁজ কর, পেয়ে যাবি।' পরের দিন সকালে এ বাজার, ও বাজার ঘুরে কোথাও না পেয়ে গেলাম নিউ মার্কেটে। সেখানেও পেলাম না। আমরা তো হতাশ হয়ে পড়লাম। কি ভেবে মনে নেই, শেষে চলে

গেলাম বউবাজারে। দেখলাম একটি দোকানে রয়েছে মাত্র দুটি পদ্মফুল। কি যে আনন্দ পেলাম আমরা তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ফুল নিয়ে মহা উৎসাহে সেদিন আমরা দীক্ষা নেবার জন্য গদাধর আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলাম। ললিত মহারাজের নিকট দীক্ষা লাভ করে আমরা ধন্য হলাম। এই ঘটনাটি শ্রীশ্রীঠাকুরের অহেতুক কৃপার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন।

দীক্ষা নেবার পর একদিন পঞ্চুদা আমায় বলেছিলেন, 'তোমরা কতবড় শক্তিশালী মহাপুরুষের নিকট দীক্ষা নিলে তা একদিন বুঝবে।' গুরুদেবের কালীপূজার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন পঞ্চুদা। তাঁর মুখে পূজার বর্ণনা শুনে আমরা আশ্চর্য হতাম। মা কালীর পায়ে একটি একটি করে পদ্মফুল নিবেদন করছেন গুরুদেব আর ফুলের পাপড়িগুলো সুন্দর ভাবে সঙ্গে সঙ্গে খুলে যাচ্ছে। তদ্দর্শনে পূজায় যোগদানকারী ভক্তদের মনে অভাবনীয় ভাব-ভক্তির উন্মেষ হয়েছিল।

পঞ্চুদা আমাদের বড়ই হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাঁকে পুনঃ পুনঃ বলতে শুনেছি, 'লেগে পড়ে থাক। অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করবে।'

গুরুদেবের অনেক কথা পৃথক্ একটি জীবনী লিখে প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল। গুরুদেবের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের আলোচনা এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রচনা ও অল্পসংখ্যক পত্রাবলী সংবলিত বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশের কার্যে সহায়তা করতে পারায় নিজেকে ধন্য মনে করি।

ওঁ ব্রহ্ম মেতু মাম্। মধু মেতু মাম্। ব্রহ্ম মেহব মধু মেতু মাম্।*

---

* তৈঃ আঃ ১০।৪৮।১ মহানারায়ণ উপনিষৎ ১৭।৬

দ্বিতীয় ভাগ

স্বামী কমলেশ্বরানন্দের দিনলিপি হইতে সংকলিত

শ্রীশ্রীমা

উদ্বোধনে একদিন মা হরিনামের মালা নিয়ে জপ করছিলেন পা ছড়িয়ে। আমি প্রণাম করতে তিনি বলেছিলেন, 'আমি ঠাকুরের কাছে দিয়ে খালাস। আমি ঠাকুরকে বলি, 'প্রভু, আমার তো মনে থাকে না। তুমি সকলকে দেখো।' (সেখানে কপিল মহারাজ বসেছিলেন)।

একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'মা, ঠাকুরকে পতিভাবে সেবা করতে ইচ্ছা করে।' মা বলেছিলেন, 'বাবা, তিনি জগন্নাথ, জগৎপতি।' অন্য সময়ে বলেছিলেন, 'চাঁদা মামা সবারই মামা। ঠাকুর সবার।'

একদিন স্নানের পূর্বে মা তেল মাখছিলেন। চুল এলো, পা ছড়ান, সে এক অপূর্ব দর্শন। ভাবলে অবাক্ হতে হয়। সেই এক রূপা। আর একদিন ইচ্ছা হল প্রণাম করার সময়ে যে মা যদি চরণ দু-খানি আমার বুকের উপর রাখেন। ভাববার সঙ্গে সঙ্গে অমনি আমার বক্ষে তাঁর চরণ ধারণ করেছিলাম। আমায় চৈতন্য করে দিয়েছিলেন। দেখেছিলাম সবই তাঁর কৃপায় হচ্ছে। চলা ফেরা বসা নিঃশ্বাস পড়া পর্যন্ত। সেইভাব দীর্ঘকাল ছিল।

মাকে বললাম, 'মা, ঠাকুর যেন আমায় টেনে নেন।' তাতে মা বললেন, 'ঠাকুর টেনেছেন বাবা, না হলে কি এমন বুদ্ধি হয় !'

আমাদের চোখে মাঠাকরুনকে দেখতে গেলে কিছুই দেখা হবে না। অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায় বিফল হবে। তাই যাঁরা তাঁর কৃপায় তাঁর তত্ত্ব বুঝেছেন তাঁদের চোখে দেখতে হবে। স্বামীজীর কথাই বলি। স্বামীজী এক পত্রে লিখেছেন—'ঠাকুর গেছেন তাতে কিছু নয়, মা আমাদের আছেন।' এ কথার কি অর্থ তা আমি জানি না। তবে কথা হচ্ছে এটা স্বামীজীর নিজের হাতের লেখা, এখনো

পাওয়া যাবে। একসঙ্গে মাসের পর মাস বছরের পর বছর কেটে গেল, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হয়েও একদিনের জন্য চিত্তবিকার হল না, এই তত্ত্ব প্রভুর কৃপায় যিনি বুঝবেন তিনি জিতেন্দ্রিয় হবেন। ঠাকুর বলেছিলেন, 'সবাই মনে করে, এখানেই (অর্থাৎ তাঁর কাছেই) সব কিন্তু যিনি আসল তিনি ঐ নহবতে বসে আছেন।'

পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ মার কথা বলতে গিয়ে বলতেন, 'ওরে তোরা মার চরিত্র দেখ। মা সর্বংসহা। বেটারা মনে কর ঠাকুরকে আমরা দেখেছি তবে কি হল, আর তোরা মাকে দেখছিস তোরা কি চাস? ঠাকুরের আধখানা হলেন মা। ঠাকুরকে দেখাও যা, মাকে দেখাও তাই।'

মার দেশে গিয়েছিলাম মাখন, মুক্তি, ছেক্কু ও আমি। মনে পড়ছে মা সেই স্বহস্তে খেতে দিয়েছিলেন। তিনি 'আর নেবে বাবা, আর নেবে বাবা' বলায় চুপ করে রইলাম। পরে বললাম, 'হ্যাঁ একখানি দিন।' তিনি বলতেন, 'ভবানীপুরের ছেলেটি কোথায়?' সেই পুনরায় কেতোকে দিয়ে প্রসাদ দেওয়ার কথা মনে পড়ছে। মার জন্মোৎসবের প্রসাদ কি অপূর্ব!

সেই মা ছেলেদের আহারান্তে উচ্ছিষ্ট স্বহস্তে পরিমার্জন করছেন, গুরু-শিষ্য বোধ থাকলে কি এটা সম্ভব! কৃষ্ণলাল মহারাজ বলেছিলেন, 'মা কি করছেন? ওদের সকড়ি কি আপনার পাড়তে আছে!' মা বললেন, 'কেন বাবা! ওরা যে আমার ছেলে।'

কোঠারে রামবাবুদের জমিদারী দেখতে মা গেছেন। তাঁরা শিষ্যঘর কোন কাজটি করতে দেবেন না দেখে বলে পাঠালেন, 'ওগো, কিছু পান দিও। পান সাজব। বসে বসে অমনি কি বাপু থাকা যায়—তিনি বারন করতেন। মেয়েছেলে কাজ না করে থাকতে নেই।' শুনতে পাই ঠাকুর নাকি যখন কোন কাজ না থাকত তখন গিয়ে একতাল দড়ি এনে পাকাতে দিতেন। অথবা ঐ রকম কোন না কোন একটা কাজ এনে দিতেন। কৃষ্ণলাল মহারাজকে মা

বলেছিলেন, 'কেষ্টলাল, কাজ কর কাজ কর, কাজ করলে মন ভাল থাকে।'

মার নিরভিমানিতা সম্বন্ধে এইটুকু বললেই হবে, লোকের কিছু নেই তবু নিজেকে একটা কিছু ঠাউরে নেয়। নিজেকে প্রচার করতে লোকে কত কৌশল অবলম্বন করে। অমুক বড়লোক, তমুক বড়লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ দেখিয়েও বড় হতে চায়। কিন্তু কি আশ্চর্য দেবীজ্ঞানে শতসহস্র লোক যাঁকে ফুল দিচ্ছে, যাঁর চরণ বন্দনা করছে. আর যাঁর স্বামীকে লক্ষ লক্ষ লোক ঈশ্বরাবতার বলে পূজা করছে, তিনি কিনা সামান্যভাবে জীবনটা কাটিয়ে দিলেন। কেউ ভাগ্যবান তাঁকে ধরতে পারলে, বাকীরা নয়। প্রভুর এবারকার লীলা বোঝা ভার। শ্রীশ্রীঠাকুরের যোগবিভূতি ছিল, মুহুর্মুহুঃ সমাধিভাব হত, শ্রীশ্রীমাব তাও ছিল না। একেবারে সহজ সাধারণ জীবন যাত্রা। একেবারে সাধারণ! জীবের সাধ্য কি তাঁকে চেনে। তিনি নিজে স্বরূপ প্রকাশ না করলে তাঁকে চেনা দুঃসাধ্য। তাই প্রার্থনা করি, মা, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও। তোমার সন্তান চিরকাল তোমার কাছে সেই মতো থাকি। অত বোঝাবুঝিতে দরকার নেই মা, দবকার নেই।

তাঁর ধৈর্যের কাছে পৃথিবীও হার মানেন। একথা হৃদয়ঙ্গম করতে হলে তাঁর পারিষদ-ভক্তরা, যাঁরা নিগূঢ়ভাবে তাঁর কাছে থেকে তাঁর সকল আচরণ শ্রদ্ধার সহিত ও প্রেমের সহিত দেখেছেন তাঁরাই, সে কথা বলতে পারবেন। রাধুর (মায়ের ভাইঝি) সঙ্গে মায়ের যে একটা আন্তরিক স্নেহের সম্বন্ধ ছিল তা মায়ের সন্তানেরা অনেকেই জানেন। তার শরীরটা অত্যন্ত খারাপ ছিল তাই মা সর্বদা তাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। আর তার আবদার যে কত সে কথা লিখে বোঝান যায় না, কিন্তু মা অম্লানবদনে তাঁর সকল আবদার সহ্য করেছেন। জগৎ স্বার্থের ফিকিরে ফিরছে। মায়ের ভাইয়েরা মার কাছ থেকে কেবল আদায়ের চেষ্টায় ছিলেন। মার যা কিছু

জিনিসপত্র দেখতেন কেবল 'দাও' 'দাও' এই রব। 'দিদি তোমার ওতে কি হবে? তোমার আবার হবে: আমাদের দাও।'—সর্বদা এই কথা। হয়ত কলকাতা থেকে যাবার সময় একটা সামান্য মশারি নিয়ে গেছেন তাই ভাইয়েরা এসে কেউ চেয়ে বসলেন কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার মা কখনও তাদের বিমুখ করেননি। আর যিনি জগৎকে দিতেই কেবল এসেছেন তিনি কেমন করে বিমুখ করবেন! তবে যে যা চেয়েছে মা তাকে তাই দিয়েছেন।

প্রার্থনা করি মা চোখের ঠুলি খুলে দিন তাঁর অভয় পদ যেন নেহারি। তবে ভয় নেই এটা তাঁর আশীর্বাদে বুঝেছি, আর কিছু বোঝবার দরকার নেই। অবতারের শ্রীবিগ্রহ দর্শনে ঈশ্বরদর্শন হয় কিনা জানিনা, এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার ইচ্ছাও হয় না। তবে মার কৃপায় বিশ্বাস করি এবং শাস্ত্রেব সঙ্গে মিলিয়েও পাই।

রাজা মহারাজ

আমি স্বপ্নে তাঁর কাছে দীক্ষা পেয়েছিলাম। সেই কথা তাঁকে বলায় তিনি বলেছিলেন, 'বেশ বেশ, তুই খুব জপ কর।' আমাকে খুব উৎসাহিত করলেন।

১৯১২ সালে দুর্গাপূজার সময় আমি চাটগাঁয়ে পূর্ণানন্দ জগৎপুর আশ্রমে গিয়েছিলাম। ফিরে এলে মহারাজ আমায় বলেছিলেন, 'কোথায় গেছলি? যাবি তো আমাদের কাছে চলে আয়না।'

স্বামীজীর তিথিপূজার দিন শচীন, যতীনদা প্রভৃতির ব্রহ্মচর্য হয়ে গেল। মহারাজ আমায় বললেন, 'তোর এখন থাক।' তাতে আমার দুঃখ হয়েছে দেখে বললেন, 'মুখটা অমন করে রইলি কেন? হাস একটু হাস দেখি।' তারপর বললেন, 'আচ্ছা তোর ঠাকুরের জন্মতিথিতে হবে।'

সন্ন্যাসের পূর্বে যখন প্রার্থনা করতে গেলাম তখন আমি বললাম, 'মহারাজ একটা নিবেদন আছে, একটা প্রার্থনা আছে।' মহারাজ উঠানের আমতলায় বসেছিলেন। সেখানে একটা বেঞ্চের উপর গদী দেওয়া থাকত। মাঝে মাঝে প্রভাতে একটু বেড়িয়ে এসে তিনি তাতে বসতেন। আর বৈকালে গঙ্গার সামনে লন-এ এসে বসতেন। আমার কথা শুনে বললেন, 'বেশ বেশ, একটা প্রার্থনা কিরে সহস্র প্রার্থনাও পূর্ণ করব।' আমি বললাম, 'মহারাজ, সন্ন্যাস চাই।' বললেন, 'বেশ বেশ, তাই হবে।'

শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁর দাসকে কমলেশ্বরানন্দ এই নাম দিয়ে সন্ন্যাসের সময়ে কৃতার্থ করেন। এবং সেই হোমের সময়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোর পছন্দ হয়েছে তো?' আমার ভিতরে ভিতরে এই ভাবটি ছিল 'গোবিন্দানন্দ' নামটি বেশ। যাই হোক গুরুদেব পুনরায় ঐ নামটি 'বড় সুন্দর' 'বড় সুন্দর' বলে উৎসাহিত করলেন। কি বুদ্ধি আমার, বলিহাবি যাই! প্রভুর জয় হোক। প্রভুর জয় হোক।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আমাদের ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠানের কথা। ব্রহ্মচর্য হচ্ছে সে কি আনন্দের ব্যাপার। শ্রীশ্রীমহারাজ উত্তরমুখে আসীন, পাশে অন্যান্য সব মহারাজরা। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ, শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ ও শ্রীশ্রীশরৎ মহারাজ প্রভৃতি আছেন। আর শ্রীশ্রীমহারাজ পূজনীয় রামকৃষ্ণানন্দের সেই 'ওঁ ব্রহ্মচর্যব্রতসূত্রাণি' পড়ছেন। সে কি অপূর্ব ব্যাপার যখন 'ত্রিতাপ-নাশাত্মকায়' এই মন্ত্রাংশ পাঠ হল এবং শ্রীশ্রীমহারাজ যেন আনন্দাম্বুধিতে মগ্ন হলেন। এই আনন্দ-সাগরে মগ্ন হবার জন্য পূজনীয় প্রেমানন্দ-স্বামী কতবারই না আমাদের বলেছিলেন, 'ওরে ডুবে যা, ডুবে যা, ডুবে যা, উপরে উপরে ভাসলে কি হবে। উপরে ভাসলে চলবে না। ডুবে যা, ডুবে যা। দিনকে রাত আর রাতকে দিন করে ফেল দেখি। তোদের দেখে জগৎ শিখুক।'

কি উৎসাহই দিতেন, মনে হলে মনে হয় আমরা এঁদের কাছে না এলে কি অমানুষই হতাম।

শ্রীশ্রীমহারাজ আমায় বলেছিলেন, 'ললিত, শেষে মনই গুরু হয়, guide (চালনা) করে নিয়ে যায়। স্থূল শরীরে গুরু তো থাকেন না বেশী দিন। ঠিক দর্শন হলে আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না। প্রাণেই সাড়া পাবে। যতক্ষণ জিজ্ঞাসা ততক্ষণ ঠিক হয়নি। ভগবদ্দর্শন হলে জীবন কৃতার্থবোধ হবে।'

আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'মহারাজ, অহংকার যাবে কি করে?' তিনি বলেছিলেন, 'ও অহংকারের কি আঁট আছে তোর।' এমন হেসেছিলেন আমার মনে হচ্ছে এখন ভগবান সম্বন্ধে রাসে যেমন আছে 'নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত' * অবিকল তাই।

ভোর রাত্রে উঠে শ্রীশ্রীমহারাজ বলতেন, 'জাগনেওলা জাগো, শুননেওলা শোনো।'

একদিন ধ্যান করে উঠে মহারাজ বলেছিলেন, 'দেখ ললিত, ঠাকুর সময় সময় পঞ্চবটীতে মধুর বংশীধ্বনি শুনতে পেতেন।' আমার দেখে মনে হয়েছিল যেন মহারাজ স্বয়ং তখন ঐ ধ্বনি শুনছেন। বললেন, 'ছাখ্, যাহা আছে ভাণ্ডে, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে। এইরকম বাহিরে যেমন নদ-নদী পাহাড়, অবিকল তেমনি সব ভিতরেই আছে।'

মহারাজ আমায় ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'ললিতলবঙ্গলতা'। তিনি আমায় বলেছিলেন, 'সুখের পায়রা'।

পরেশ মহারাজ ও আমি অযোধ্যা থেকে ফিরে প্রাতে কাশীতে অদ্বৈত আশ্রমে তাঁর কাছে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, 'তুই ঐখানে একটা মঠ কর তো বাবা।' বারবার ঐ কথা বলেছিলেন।

একদিন যখন মহেশবাবুর টোলে পড়তে যাব আহারাদি সম্বন্ধে

---

* ভাঃ ১০।৩১।২ তোমার হাস্য নিজজনের গর্বনাশক

নিজে থেকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'মাখন খাবি, ঘি খাবি, দুধ খাবি। দুধে nerves soothe (স্নায়ুকে স্নিগ্ধ) করে। আলোচালের ভাত খেতে হবে। ঘি থাকলে আমাশা হয় না। মাখন খেলে শরীর স্নিগ্ধ থাকে।'

যেদিন কাশীতে ঠাকুরের নূতন পট বদলান হল, যোগী অভিষেক করতে লাগল, আমি রুদ্রী পড়লাম। মহারাজ 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে নৃত্য করেছিলেন। সেদিন বৈকালে একান্তে পেয়ে বলেছিলাম, 'আপনি আসাতে দুই আশ্রম আনন্দের স্রোতে ভাসছে।' তাতে বলেছিলেন, 'তোরা ভক্ত কিনা তাই বলছিস।' তারপরই বললেন, 'দেখ বাবা, চৈতন্যের উন্মেষ হলে এরকম হয়।'

একদিন বাবুরাম মহারাজকে বলেছিলেন, 'বাবুরামদা, অমুকগাছ তুলতে পার শিকড়শুদ্ধ? আমি পারব না। সব চৈতন্যময় দেখছি।'

ঢাকায় একদিন বলেছিলেন, 'দেখ ললিত, তোদের কেউ কিছু বললে আমাদের মুখ ছোট হয়ে যায়। কেউ সুখ্যাতি করলে আমাদের বুকটা দশহাত হয়ে যায়।'

একদিন বলরাম মন্দিরে থাকাকালীন সূর্যকে বলেছিলেন, 'ঠাকুর আজ এসেছিলেন।' সূর্য বললে, 'তাহলে তাঁর গায়ের হাওয়া লেগেছে তো ভাই বলতে হবে।' আমি মনে মনে ভাবলাম মলয়ের হাওয়া লাগলে সারবান বৃক্ষে চন্দন হয়।

মহারাজ বলেছিলেন, 'সত্যে থাকলে সত্যের ঠাকুরকে পাওয়া যায়।'

আরও বলেছিলেন, 'দেবার জন্য তো বসে আছি, নিতে চায় কে? কেউ কিছু করবে!'

শ্রীশ্রীমহারাজ যে মাছ ধরতেন এ সকলের গূঢ় অভিপ্রায় অনেকে না জেনে তাঁকে নিষেধ করতেন। কারণ অতবড় রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের প্রেসিডেন্টের পক্ষে এসব মানায় না; লোকে কি মনে

করবে! কিন্তু তিনি স্বয়ং তা কিছু একটা অন্যায় হচ্ছে বা লোকে কিছু মনে করবে তা মনে করতেন না। যখন তাঁর ইচ্ছা হত কারোর কথা তিনি শুনতেন না। শুনবেনই বা কেন? প্রভু তাঁর সকল আচরণ যে পূত করে দিয়েছিলেন।

আমাদের শাস্ত্রও তাই বলছেন। ভক্তের প্রত্যেকটি আচরণই শুভ আচরণ, তাঁরা যা করেন তাই শুভ কর্ম, তাঁরা যা বলেন শুভ শাস্ত্র অর্থাৎ সৎ শাস্ত্র। তাঁরা শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের পারে যান। শাস্ত্র তাঁদের এটা কর, ওটা করোনা এসব অনুজ্ঞা দিতে পারেন না। প্রত্যুত তাঁদের কর্ম 'তেজীয়সাং ন দোষায়' বলে শ্রীমদ্‌ভাগবৎ মান্য করে গেছেন।

খোকা মহারাজ বলতেন, 'মহারাজের কাছে গেলে যেমন শান্তি পাই এমন আর কোথাও পাই না। একটি ছেলের উপর খোকা মহারাজের টান ছিল। হঠাৎ সেই ছেলেটি মারা যাওয়ায় খোকা মহারাজ বড় কষ্ট পান। তাঁর সেই শোক মহারাজের কৃপায় বিদূরিত হয়।

মহারাজের সঙ্গে সেই শিবরাত্রিতে বালির কল্যাণেশ্বর দর্শনে যাওয়ার ঘটনা মনে পড়ছে।. আর মহাপুরুষের সঙ্গে সেই দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার ঘটনা। দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের প্রাঙ্গণে লক্ষ্মীদিদির সঙ্গে দেখা হল। লক্ষ্মীদিদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর শীতলার অংশ বলতেন। সেই জন্য মহারাজ দেখা হলে বলতেন, 'দিদি, একটু হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ কর।'

কারোর বিরুদ্ধে কেউ কোন অভিযোগ করলে মহারাজ বলতেন, 'ভগবানকে কি ফরমাস দিয়ে লোক পাঠাতে বলব?'

কালী মহারাজ একদিন মহারাজকে বললেন, 'যেদিকে দেখি সব মহারাজ, আর মহারাজ। যত slave mentality (দাসসুলভ মনোভাব)। রাজা তুমি ওদের অমন করে ফেলেছ কেন?' মহারাজ তার উত্তরে বলেছিলেন, 'আমি তো কিছু বলিনি। ওরা ভালবাসে তাই। আর আমায় কি করে? হরি মহারাজকে দেখ। সবাই তাঁর কাছে যেতে চায়।'

মহারাজ একদিন মঠে ঠাকুর-ভাঁড়ারের সামনে যেখানে উঠানে কাঁঠাল গাছ ছিল সেখানে পিছন থেকে এসে হাত তুলিয়ে আমার পিঠে ছোট ছেলেরা যেমন খেলা করে তেমনি স্পর্শ করেছিলেন, থপ্ করে। (অমূল্য মহারাজ ১৩. ১১. ১৯৩৫ সালে বলেছিলেন, 'আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।')

দুর্গাদেবীর দর্শন পেয়ে মহারাজ দুর্গাপূজা করতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি কিছু না দেখলে পূজা করি না।'

ঠাকুরের দর্শন পাওয়া সম্বন্ধে আমি সুধীর মহারাজকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করিয়েছিলাম। তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন, 'ভাবে দেখি। কখন এমনিও দেখি।'

নিজের তৈলমর্দন সম্বন্ধে মহারাজ বলেছিলেন, 'যোগিচর্যায় এসব আবশ্যক হয়।'

তিনি আমায় যোগ শেখাবেন বলেছিলেন। পরে বলেছিলেন, 'শহরের আবহাওয়া ভাল নয়।'

মহারাজ বলতেন, 'দক্ষিণদেশে গিয়ে ইচ্ছা হয়েছিল যে গঙ্গাজল ও মহাপ্রসাদ খাইয়ে সব (হিন্দুধর্মে) ফিরিয়ে আনি।'

মহারাজ বলতেন, 'সময় নষ্ট করিসনি, সময় নষ্ট করিসনি। লেগে পড়, লেগে পড় দিকি একবার।'

মহারাজ প্রত্যহ physical exercise (ব্যায়াম) করতেন। ঘরে আয়না ছিল। রাত্রে ছোট বাতি জ্বালা হত। সাধারণের বসবার জন্য একটা কার্পেট পাতা থাকত। দুটি খাট ছিল, শোবার আর বসবার। তাঁকে দেখলে অনেক সময়ে উন্মনা বলে মনে হত। মহারাজ কোন জিনিস ফেলা-ছড়া পছন্দ করতেন না। সব জমিয়ে রাখতেন। তার উদ্দেশ্য ছিল লক্ষ্মী স্বয়ং আসছেন তাঁকে কি ছাড়তে আছে। টাকা-পয়সা খরচের ব্যাপারে খুব হিসেবী ছিলেন, এ বিষয়ে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য ছিল।

মহারাজ বলতেন, 'কখন কখন দেখি অনেকের লক্ষণ হয়ত

ভাল তারপর দেখলুম সব ভেস্তে গেল। আবার দেখেছি লক্ষণ হয়ত খারাপ কিন্তু ভগবানের কৃপায় উঠে গেল। তোদের হাউয়ের মত হু হু করে উঠতে হবে।'

মহারাজের বিশেষত্ব এই ছিল যে তিনি যেমন একদিকে উচ্চ, উচ্চতর তত্ত্বে নিমগ্ন থাকতেন তেমনি সামান্য কাজও অতি উত্তমরূপে করতে পারতেন।

একবাব মহারাজকে বলেছিলাম, 'মহাবাজ, আপনি আমাদের সম্বন্ধে indifferent (উদাসীন)।' তাই শুনে বললেন, 'সে কি বাবা। তোরা এসে জিজ্ঞাসা কবেছিস আর আমি বলিনি এমন কি কখন হয়েছে?' আহা সেই মধুর মূর্তি মনে পড়ছে আর সেই সকরুণ দৃষ্টি!

কাশীতে পডতে যাব, তিনি বললেন, 'বেশ বেশ, কিন্তু ওখানে গিয়ে একটু দুধ খাবি, একটু ঘি খাবি বাবা। ঘি না খেলে আম হয় পেটে। দুধ খাবি—দুধ খেলে ব্রেন ভাল থাকে।' পুনঃ পুনঃ এ কথা সে কথাব পব ঐ এক কথা। ক্রমাগত এই চলেছে। বলরাম মন্দিরে ঐ কথা হল। বড় ঘরে ঢুকেই প্রথম দরজার সামনে আমি যখন যাব মহারাজ বলরাম মন্দিরে নিতাইবাবুর ঘরের সামনে বসে খাচ্ছেন। আমি যেমন বললাম, 'মহারাজ, তবে আমি আজ আসি' অমনি মহারাজ একটা আম একটু মুখে দিয়ে আমায় খেতে দিলেন।' সে পিতার ন্যায় পুত্রবাৎসল্য মনে হলে প্রাণ অধীর হয়।

কথা কইতে কইতে তাঁর গায়ে পানের পিক্ পড়ে গেল, আমি জল দিয়ে ধুয়ে দিলাম, তিনি কিন্তু একটা কথাও বললেন না।

শ্রীশ্রীমহারাজ বলতেন, 'তেমন তেমন ভাব এলে চাপাই মুশকিল। দিলে নেবে কে? রাখবে কে? 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।' যে অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিরূপ যোগ হচ্ছে জ্ঞানবিজ্ঞান আর তার পরিরক্ষণ হচ্ছে ক্ষেম। জ্ঞানভক্তি ভগবানের কৃপায় পাওয়া যায় আর ভগবানের কৃপায় তিনি নিজেই উহা রক্ষা করেন। না রক্ষা নয়,

তিনি নিজে বহন করে, মাথায় বহন করে ভক্তের নিকট এসে হাজির হন।'

একবার বেলুড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপটখানি অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাঁর মূর্তি নবকলেবর হবে স্থির হয়। অতঃপর সেই নবকলেবরের যখন অভিষেকাদি হল তখন পূজারী লক্ষ্মণ মহারাজ এবং তন্ত্রধারক এই শ্রীমান্ কমলেশ্বরানন্দ।

নূতন পটপূজার জন্য অভিষেক করবার সময় ভুবনেশ্বর মঠের কর্মাধ্যক্ষ বলাই মহারাজের গায়ে একটা কাটা ফতুয়া জামা দেখে মহারাজ বললেন, 'ও কিরে, ওটা ছেড়ে আয়। ঠাকুরের জোগাড় দিচ্ছিস, ওরকম জামা পরে কেন!' এই প্রসঙ্গে আরও মনে পড়ছে তিনি অতি ছোট-খাট ব্যাপারেও, বিশেষ করে শ্রীশ্রীঠাকুর সংক্রান্ত বিষয়ে সাত্ত্বিক ও সদাচার পছন্দ করতেন। একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের বাসনের নিকট কে মুখ ধুচ্ছে, তিনি সেইখানে পদচারণ করছেন, হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ও কিরে ওখানে ঠাকুরের বাসন রয়েছে, অমন করে মুখ ধুচ্ছিস! যদি তোর মুখের জলের ছিটে ওতে লাগে। সাবধান! অমন করিসনি। আমার বাপু বড় ভয় করে।'

এই প্রসঙ্গে আরও মনে পড়ছে একবার মঠে খাবার চাল এসেছে নৌকা করে। মঠের ঘাটে ঐ চাল নেমেছে। নিয়ে যাবার সময়ে ঐ চালের কয়েকটি দানা মঠের প্রাঙ্গণের সম্মুখে বারান্দায় পড়ে আছে। শ্রীশ্রীমহারাজ নেমে এসে সেগুলি দেখে কাকে বললেন, 'ওরে ওগুলো ওখান থেকে তুলে নে। মা লক্ষ্মীর ওপর দিয়ে অমন করে মাড়িয়ে যেতে নেই।'

এই প্রসঙ্গে আরও অনেক ঘটনা মনে পড়েছে যা তাঁর সদাচারের পরিচয় দেবে। ১৯১২ সালে যখন শ্রীশ্রীমহারাজ কনখলে যাচ্ছিলেন, সঙ্গে পূজনীয় রামলালদাদা ছিলেন। পূজনীয় মহারাজ রামলাল-দাদাকে বড় ভালবাসতেন। তার কারণও ছিল, শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে

যখন শ্রীশ্রীমহারাজ প্রথম যান তখন রামলালদাদাই তাঁকে সঙ্গে করে ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরের কাছে হাজির করেছিলেন। শ্রীশ্রীমহারাজ ঐ ঘটনা এত প্রাণের সহিত মনে রেখেছিলেন যে সেই অবধি শ্রীযুত রামলালদাদাকে পরম মিত্র জ্ঞান করতেন। এবং ভাবতেন যিনি ভবসাগরের কাণ্ডারী তাঁর সঙ্গে ইনিই প্রথম যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন, সুতরাং এঁর চেয়ে বড় বন্ধু আর কেউ নেই। মহতের সকল আচরণই মহৎ। কি অদ্ভুত কৃতজ্ঞতাবোধ! আর আমরা? একথা ভাবলে মনে হয় আমাদের জীবনে কত ব্যাপারে কত অকৃতজ্ঞতা না প্রকাশ করি—ওঁদের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনেরও তো অধিকারী নই। তথাপি জানি না কোন্ ভাগ্যবশতঃ তাঁদের শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং শুধু তাই নয় তাঁদের সঙ্গে বাস করার—তাঁদের 'লোকে' বাস করার সৌভাগ্য হয়েছিল। শাস্ত্রে সত্যলোকের যে বর্ণনা দেখি তাতে বলে, যেখানে সত্যাশ্রয়ী মহাপুরুষগণ বাস করেন তাই সত্যলোক। তাই শুনে মনে হয় এই বেলুড় মঠটি তাহলে নিশ্চয়ই সত্যলোক। কারণ এঁদের মতো সত্যনিষ্ঠ, সত্যদর্শী, সদাচারী লোক যখন এখানে বাস করছেন, এটা নিশ্চয়ই সত্যলোক। তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে একথা বলা ও বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা এ বিষয়ে শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীমুখে যা শুনেছি তাই এখন বলি। তিনি স্বয়ং শ্রীমুখে কতবার বলেছেন, 'আহা, আহা, এ স্থান কৈলাস, কৈলাস। এখানে গুরু গঙ্গা একসঙ্গে রয়েছেন। এখানে স্বামীজী দেহ রেখেছেন। এ স্থান বৈকুণ্ঠ। দেবদুর্লভ স্থান।' অবশ্য অত তখন বুঝিনি, এখনো যে বুঝি তা নয়। তবে মনে হয় এ স্থান যে অতি পবিত্র তা নিঃসন্দেহ। মহাত্মারা যে স্থানে থাকেন সেই স্থান যে পবিত্র এ কথা বলাই বাহুল্য।

মহারাজ প্রাতে ধ্যান করে উঠে যখন আমাদের কিছু সদুপদেশ দিতেন তখনই এ সব বাণী তাঁর শ্রীমুখ থেকে শুনতাম। কিন্তু বুদ্ধির স্বল্পতাবশতঃ কিছু বুঝতাম না। শুনতে পাই স্বামীজী নাকি

মহারাজের বারান্দার পরে ভিসিটার্স রুম-এর উপর যে গোল বারান্দা আছে সে স্থান থেকে দাঁড়িয়ে বলতেন, ঐ স্থানের যে মাধুর্যময় দৃশ্য তা তিনি এত জায়গা পরিভ্রমণ করে এসেছেন কিন্তু কোথাও পাননি। মঠের মধ্যে আর একটি স্থান মহারাজ বড় ভালবাসতেন। সেটি হচ্ছে স্বামীজীর মন্দিরে যে দীর্ঘ সরলাকার দেবদারু পাদপশ্রেণী আছে সেই স্থানটি। স্বামীজী অনেক সময় সানন্দে ধূমপান করতে করতে ঐ স্থানে পদচারণা করতেন। এবং একদিন শ্রীশ্রীমহারাজকে বলেছিলেন, 'রাজা, আমায় এখানে একটু জায়গা দিতে পারিস?' মহারাজ তার উত্তরে বলেছিলেন, 'ভাই, তোমারই তো সব। তোমায় আবার জায়গা দেব কি?' কিন্তু স্বামীজীর ভাব ছিল যে মঠটি যখন ট্রাস্ট ডীড্ করে তাঁদের নামে দিয়েছেন তখন ওটা তো আর তাঁর নয়, সুতরাং ঐ স্থানটিতে কিছু করতে হলে ট্রাস্টীগণের অনুমতি ব্যতীত কিছু করা সম্ভব নয়।

একদিন কয়েকটি লোক ঠাকুরের দাঁড়ান অবস্থায় ছবিতে যে এক হাতের দু' আঙ্গুল ঊর্ধ্বদিকে আর অপর হাতের তিন আঙ্গুল অধঃদেশে নির্দেশ আছে তার অর্থ জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন, 'সবেরই একটা ভাব নিতে হয়। ওর মানে প্রকৃতি পুরুষ ও ত্রিগুণ এরূপ একটা হবে। ত'ার সমাধি অবস্থায় স্বভাবতঃই এরূপ নানারকম মুদ্রা দেখতে পাওয়া যেত।'

ত'ার কথা—'যেখানেই থাক ভগবানকে নিয়ে থেকো। বাপমাকে সেবাদ্বারা প্রসন্ন করলে ভগবান তুষ্ট হন।'

পূজনীয় মহারাজ অলৌকিকভাবে দেহরক্ষার পূর্বে যে রাত্রে নানা উপলব্ধির কথা বলেন, আমি ও অমৃতেশ্বরানন্দ বাগবাজারে জ্ঞান মহারাজ যে একটি স্থান করেছিলেন সেখানে রাত্রিযাপন করি। তার পরে দু'এক দিনের মধ্যেই মহারাজের স্থূল শরীর চলে যায়। এসবের একটা গূঢ় অর্থ আছে।

মহাপুরুষ মহারাজ

মহাপুরুষ মহারাজ গেস্ট হাউসে ধ্যানে বসেছিলেন। এমন সময় আমি গেলাম। প্রায় তিন ঘণ্টা হরিকথা হয়েছিল। শেষে আমি ক্ষমা চেয়ে বলেছিলাম, 'আপনি ধ্যান করতে যাচ্ছিলেন, আমি এসে disturb (বিরক্ত) করলাম।' উত্তরে বলেছিলেন, 'কি বলছ ললিত, এই যে ঠাকুরের কথা হল, এতে আমার ধ্যান হল না? তবে কি হল? বৃন্দাবনে যে সব ভক্তেরা ঝুপড়িতে বসে জপধ্যান করে কোন ভক্ত কাছে এলে সেদিন অনন্যকর্মা হয়ে তার সেবা করে। তোমরা তো ভক্ত।'

তাঁকে বলেছিলাম, 'মহারাজ আপনার কাছে উপনিষদ্ পড়ব, তিনি বলেছিলেন, 'ললিত, আমাদের জীবনটাই তো বেদান্ত।' তিনি ঈশ কেন কঠ উপনিষদ্ আমায় পড়তে বললেন। আমি তৈরি করে রাখতাম আর মহারাজের বাবান্দায় বসে বসে পড়া হত। তিনি সেই উপলক্ষে ঠাকুর-স্বামীজীব জীবনের ঘটনার ভিতর দিয়ে সব বুঝিয়ে দিতেন।

কেন উপনিষদের হৈমবতী উমার কথায় তিনি বলেছিলেন, 'জগদ্ধাত্রী দেবীই সেই হৈমবতী।' অনেকদিন পরে 'শব্দকল্পদ্রুম' খুলে দেখলুম জগদ্ধাত্রী শব্দের ব্যাখ্যায় তাই আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, শশীভূষণ সান্ন্যাল মহাশয়ের মুখে তিনি চল্লিশ বছর পূর্বে ঐ কথা শুনেছিলেন।

মহাপুরুষজী আমার নিকট পুরুষসূক্ত শুনতে বড় ভালবাসতেন। মাঝে মাঝে বেদ আনিয়ে তিনি শুনতেন। 'পাদোঽস্য বিশ্ব ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' অংশটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। 'যত্যাত্য-তিষ্ঠদ্দশাংগুলম্' কথাটির অর্থ তিনি করেছিলেন যে, আঙ্গুল দেখিয়ে গোণাগুণির বাহিরে। অর্থাৎ আঙ্গুল দিয়ে মানুষ যেমন গোণে, সেই রকম ভাবে দশাঙ্গুলে সকল গণনার তিনি বাইরে। 'দশাঙ্গুল'

শব্দটি উপলক্ষণ বলে সায়ণ মহীধর সবাইকে তো ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। 'দশাঙ্গুলম্ ইতি উপলক্ষণম্—ব্রহ্মাণ্ডাদ্ বহিঃ অপি সর্বতঃ ব্যাপ্য অবস্থিতঃ' (সায়ণ), অর্থাৎ 'দশাঙ্গুল' শব্দটি উপলক্ষণ, ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও তিনি সর্বত্র ব্যাপিয়া আছেন।

মহাপুরুষজীকে আমি একবার বলেছিলাম, 'আমাদের ট্রেনিং দিন।' তাতে তিনি গম্ভীরভাবে অথচ সহাস্যে বলেছিলেন—'এ কি স্কুল কলেজের ট্রেনিং নাকি! এ ট্রেনিং আর এক রকমের।'

ঢাকায় থাকাকালীন লোকেরা আমাদের মূর্খ বলে অবজ্ঞা করেছিল। ঢাকা থেকে চলে আসায় বাবুরাম মহারাজ মহাপুরুষজীর নিকট আমায় দেখিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ওর দোষ কী? তারা অযত্ন করেছিল। তাই ওরা চলে এসেছে, বেশ করেছে।' তখন আমি জো পেয়ে বলেছিলাম, 'মহাশয়, তারা আমাদের মূর্খ বলে ঠাওরাত। বেতনভোগী ভৃত্যের মত ব্যবহার করেছিল।' তখন মহারাজ সস্নেহে বলেছিলেন, 'তোমরা মূর্খ কিসে? তোমরা ঠাকুর-স্বামীজীর বই পড়েছ।'

একজন আমায় অপমান করেছিল। সে কথা অপরের নিকট শুনে তিনি আমায় বলেছিলেন, 'তুমি আমায় বলনি কেন?' আমি বলেছিলুম, 'দেখুন আপনি তাকে স্নেহ করেন। সে কেন তার থেকে বঞ্চিত হবে?' তার উত্তরে বলেছিলেন, 'দেখ ললিত, তোমরা আমার হাত-পা। আমি তো (এই স্থূল শরীরে) সব জায়গায় যেতে পারি না, তাই তোমাদের পাঠাই। তোমাদের কেউ কিছু অপমান করলে সে আমাদেরই অপমান করা হয়। সটান তাকে বলে দেবে, "উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম খোলা আছে, সরে পড়।"'

একদিন গদাধর আশ্রমে যখন চলে আসব, মহাপুরুষ মহারাজ আমার সঙ্গে এলেন। বললেন, 'দেখ ললিত, ঠাকুরের কাছ থেকে যে আলো পেয়েছি, তাই তোমাদের দিচ্ছি। আমরা দীপ থেকে দীপান্তরে যেন এক সূত্রে গাঁথা।'

তিনি বলেছিলেন, 'দেখ পরিমিত না হলে অমৃতও বিষ হয়ে যায়।'

স্বামীজীর সম্বন্ধে বলতেন, 'ঠাকুর-স্বামীজীর ভালবাসার কথা আমরা কি বুঝি! তাঁদের নরনারায়ণের প্রেম মানুষ কি বুঝবে!'

প্রার্থনা কেমন করে করতে হয় তাতে বলেছিলেন, 'প্রভু তুমি স্বয়ং-প্রকাশ, আমার কাছে প্রকাশিত হও। "আবিরাবির্ম এধি।" '

ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর দেখা 'সুলভসমাচার' পড়ে। তখন সমাধি সম্বন্ধে খুব আলোচনা করতেন। প্রথম দর্শনেই দেখেন, ঠাকুর রাম-বাবুর বাড়িতে অনর্গল সমাধিতত্ত্ব বোঝাচ্ছেন। তাঁতেই তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়েছিলেন। তারপর দক্ষিণেশ্বরে যখন আসতেন গেটের কাছ থেকে একটা বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হত। কিন্তু আশ্চর্য এই যে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হওয়ামাত্র তিনি যখন সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকাতেন, তখনি কেমন প্রাণটা শান্ত হয়ে যেত।

ঠাকুরকে তিনি মা বলে মনে করতেন (অর্থাৎ মা কালী।)

তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ঠাকুর তাঁদের মান্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন কিনা। তাতে প্রথমেই বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আমাকেই তো দিয়েছেন।' তারপর স্বামীজী ও মহারাজের নাম করেছিলেন।

তাঁর দেহরক্ষার সময় আমি 'নির্বাণষট্‌কম্' পাঠ করেছিলাম। তিনি শেষাশেষি বলতেন, 'স্থূল শরীর তো থাকবে না। তবে ঠাকুর লোককল্যাণের জন্য কিছুদিন রেখেছেন।'

একদিন তাঁকে বলেছিলাম, 'মহারাজ, আপনারা যে ভালবাসেন, এরপর আর তো তা পাওয়া যাবে না।' তিনি বলেছিলেন, 'ঠিক বলেছ। তা একি সম্ভব! ক্ষেপেছ আর কি!'

বাবুরাম মহারাজ

বাবুরাম মহারাজ বলতেন—'তোরা ঠাকুরের ফৌজ। দিনান্তে একবার ভাববি সারাদিন কিভাবে কাটালি। আত্মচর্চা বিশেষ হিতকর। self analysis (আত্মবিশ্লেষণ) করে দেখে যদি কিছু ত্রুটি থাকে তো শোধরাবার চেষ্টা করতে হয়। ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা না হলে কিছুই হল না। প্রার্থনা করতে হয়, "প্রভু আর কতদিন এমনভাবে রাখবে।" কাঁদতে শিখতে হবে তবে তো তাঁর দয়া হবে, তিনি দেখা দেবেন। তাঁকে চাইতে হবে, জোর করতে হবে, হচ্ছে-হবের কর্ম নয়। খাচ্ছি-দাচ্ছি বেশ রয়েছি, সময়মত একটু ডাকছি, এর কর্ম নয়। দিনকে রাত, রাতকে দিন করে ফেলতে হবে। খুব জোর করতে হবে, খুব রোক করতে হবে—"প্রভু দেখা দাও, নাহলে বলছি হবে না।" তবে তাঁর কৃপা না হলে কিছুই হয় না। কৃপাই আসল জিনিস। তাঁর শরণাগত হতে হবে, না হয় খুব পুরুষকার চাই—দুটোর একটা। কিছুই নেই সেটা বুঝতে হবে তমের লক্ষণ। একটা ভাব দৃঢ় করতে হবে। আমরা ঠাকুরের, আমাদের সব পাশ কেটে গেল। সব বন্ধন ঘুচে গেল। আমরা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। আমাদের আবার কিসের সাধন! সাধন যাদের করতে হয় করুকগে।'

একবার ঠাকুরের তিথিপূজার দিন পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ গেয়েছিলেন, 'আমরা গোরার সাথী হয়ে ভাব বুঝতে নারলুম রে।' তখন বলেছিলেন, 'প্রভুর অনন্ত অনন্ত ভাব যার একটা হলে ধন্য হয়ে যায় জীব। তার এক একটা ভাব কোন কোন অবতারে প্রকাশ। সে সকল ভাব তাঁতে পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল। তাঁর ভাব তিনিই জানেন। আমরা কি বুঝব!'

পরেশ মহারাজ একদিন শেষরাত্রে ঠাকুর তুলতে গিয়ে চারটের জায়গায় তিনটের সময় তুলেছিল। বাবুরাম মহারাজ সেই উপলক্ষে বলেছিলেন, 'ঠাকুরের কি ঘুম আছে!'

তিনি বলতেন, 'ঈশ্বরের বাণীই বেদ। তা যে ভাষায় হোক।'

তিনি আমায় 'ললিতা সখি' বলে কখন কখন ডাকতেন। একদিন বলরাম মন্দিরে আমরা অনেকে বসেছিলাম। আমায় বীরাসনে দেখে তিনি বলেছিলেন, 'বেটা যেন মহাবীর বসে রয়েছে।' তিনি আমাদের 'বেটা' 'বেটা' বলতেন কখনও কখনও।

রাত্রিতে খাবার পর প্রায় ১১টা রাত্রি, আমি বেলুড়ে গঙ্গার দিকের বারান্দায় চুপ করে বসেছিলাম। তিনি বললেন, 'কি করছ, গীতা নিয়ে পড়।' তিনি আমায় গীতা পড়িয়েছিলেন, মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর কতকগুলি প্রিয় শ্লোক ছিল—

"মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।"

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

পরেশ মহারাজ বললে—'ভাই যেদিন ব্রহ্মচর্য নেবার কথা ছিল, বাবুরাম মহারাজ তোমার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমহারাজকে বলেছিলেন, "ছেলেটি বেশ ভাল, ভক্তিমান"—এই বলে মহারাজের নিকট অনুরোধ করেছিলেন, "ভাই ওকে ব্রহ্মচর্য দিতে হবে।" মহারাজ বললেন, "এখন থাক।" তখন বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন, "তবে ভাই তুমি ওকে বুঝিয়ে বোলো।" ' শেষে স্বামীজীর উৎসবে তিথি-পূজায় ব্রহ্মচর্য (অনুষ্ঠান) হয়ে গেলে মহারাজ নীচে টেবিলে বসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হাস দেখি, মন খুলে হাস দেখি।' আমি হাসলাম। তিনি বললেন, 'তোর ঠাকুরের তিথিপূজাতে হবে।'

যখন একজন গম্ভীরায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কাঁথা আছে বললেন বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন—'ওরে ভ্যাখ্ ভ্যাখ্, আমাদের কিছু আছে তো।' আমি ও রাম মহারাজ সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মনে হয়েছিল আমাকেই যেন লক্ষ্য করে বলেছিলেন।

বাবুরাম মহারাজ মধ্যে মধ্যে আমাদের নিয়ে জড় করে এবং বাইরের ভক্তদের সামনে স্বামীজীর রচিত মঠের নিয়মাবলী পাঠ করে শোনাতেন। এটা আজকাল আর বিশেষ দেখা যায় না।

তিনি বলেছিলেন, 'ওরে ভালবাসলে গাছপালার থেকেও সাড়া পাওয়া যায়।'

জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় মঠে এসেছিলেন। তখনকার দিনে খুব বড় ৬ ইঞ্চি পরিধির গোলাপ তাঁকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। তিনি দেখে বলেছিলেন, 'আহা গাছ থেকে কেন তুললেন! কি সুন্দর!'

পি, সি, রায় মহাশয়ও একবার ছেলেদের নিয়ে মঠে এসেছিলেন। মহারাজ পি. সি. রায়কে আলিঙ্গন করেছিলেন।

সি. আর. দাসও এসেছিলেন এবং ত াঁর সঙ্গে একসঙ্গে বাগানে উৎসবের পঙ্‌ক্তিতেও খেয়ে বলেছিলেন, 'এ রকম আর কোন দেশে নেই। অতি সাধারণ লোকের সঙ্গে এমন ভাবে সমভাবে সমআসনে আহারাদি কোথাও নেই। সাম্যবাদের কথা তো লম্বা লম্বা শুনি।'

ভূমানন্দের সন্ন্যাসের পর বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন, 'ইচ্ছা হয় এইবার আমরা গেরুয়া-টেরুয়া ছেড়েদি। ঠাকুর কি কোন গেরুয়া পরেছিলেন!'

তিনি এক একদিন চিৎকার করে ডাকতেন, 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়। মহারাজ কৃপা করছেন।'

বাবুরাম মহারাজ বলতেন, 'ধ্যান করলে জপ করলে অভিমান হয়, কিন্তু ত াঁর কথা কইলে অভিমান হয় না অথচ ধ্যানের কাজ হয়। শুনেছি গিরীশবাবু সারারাত ঠাকুরের কথা কইতেন। তাতে অবসাদ আসত না। মজুমদার মশাইও খুব কইতেন। লাটু মহারাজ তো সারারাত জেগে থাকতেন। স্বামীজী বলতেন, "দিনটা কাজকর্মের জন্য আর রাতটা ধ্যানের জন্য।" তিনি (স্বামীজী) কত রাত ধ্যান করে কাটিয়েছেন। শ্মশানে ধ্যান করে শেষ রাত্রে স্নান করে মঠে ফিরেছেন।'

তিনি প্রতিদিন আহারান্তে এসে বসে বারান্দায় ভক্তদের পান তামাক দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। তারপর তাঁদের সঙ্গে ঠাকুরের

কথাবার্তা বলতেন। সামান্য বিশ্রাম করে এসে আবার বেলা ৩ টার সময় ঠাকুরের কথা বলা, মাঝে মাঝে সারগর্ভ উপদেশ দান, মহাভারতাদি পাঠ হলে স্বয়ং শ্রবণ ইত্যাদি করতেন। বৈকালে ক্লাসের পর আবার অপরাহ্নের কৃত্য যেমন ঠাকুরসেবা, গোসেবা, তারপর বাগানে গিয়ে জল দেওয়া, গঙ্গাজলের জায়গায় জল তোলা ইত্যাদি করতেন। দশমীর জল পরিষ্কার বলে সেইদিন প্রভুর ভাণ্ডারের জালায় পানীয় জল তোলার ব্যবস্থা করতেন। আর আমাদের সকলের সঙ্গে স্বয়ং জলের বালতি ধরে জল তুলে সকলের পানীয় জলের জন্য যে জালাগুলি আছে তাতে জল ভরাতেন। এ ছাড়া তখন মঠে কল ছিল না। শৌচের জলের জন্য যে চৌবাচ্ছা ছিল, তাতেও প্রায়ই অপরাহ্নে আমাদের সঙ্গে স্বয়ং জল তুলতেন। বলেছিলেন, 'বাবা, আমার চেলা হবে, খাটিয়ে খাটিয়ে জান নেব।' এখন প্রার্থনা করি তাঁর এই দাস তাঁর প্রভুর জন্য, তাঁর প্রিয়তমের জন্য কাজ করে জীবন সার্থক যেন করতে পারে। তিনি আরও বলতেন, 'ঘরে থাকলে তো একটা পেত্নীর (স্ত্রীর) মন যোগাবার জন্য কত খাটতে হত। একপাল ছেলেপুলে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হতে হত। বড় ভাগ্য তাই প্রভু দয়া করে তাঁর চরণে এনেছেন তাইতো প্রভুর আস্তানায় আশ্রয় পেয়েছি, তাইতো প্রভুর ভক্তদের হাতে করে সেবা করতে পারছি। তাই প্রভুর শ্রীঅঙ্গনের পবিত্রতা সম্পাদনে হাত পবিত্র করছি।' কোথায় আমাদের সে ভাব এখন, প্রার্থনা করি প্রভু তোমার দাস্য লাভ করে, তোমার চোখে জগৎটা দেখতে শিখি। বৈকালে আমাদের মঠের বাইরে যেতে দিতেন না। যদি দেখেছেন মঠের বাইরে যাচ্ছি তো আস্তে আস্তে মৃদুস্বরে বলেছেন, 'কোথায় যাচ্ছ বাবা, আয় দিকি এখানে কাঁটাগাছগুলো তুলি।' তিনি কি তাঁর প্রভুর প্রেমে মগ্ন হয়ে ধ্যানস্থ থাকতে পারতেন না। তবে তাঁর এত শতধারে কর্মের প্রবাহ ছিল কেন?

ভক্তদের শুকনো মুখ দেখলে কত সস্নেহে তাদের কুশল প্রশ্ন করে

হৃদয়ের জ্বালা নিবৃত্তি করতেন। তিনি বলতেন, 'ওরে ওরা সংসারের কত তাপে জ্বলে পুড়ে এসেছে, এখানে প্রভুর কাছে একটু শান্তি পাবে বলে। ওরে ওদের যেন কষ্ট না হয় বাবা দেখিস। ভক্ত সুখী হলে প্রভু সুখী হন। ভক্ত কাঁদলে প্রভু কাঁদেন।' কই প্রভু তোমার শ্রীমুখের সে বাণী জীবনে দেখাতে পারলাম! তাই দাসের নিবেদন, তুমি দাসের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে সেই তোমার সুশিক্ষা বিধান কর।

তিনি বলতেন, 'বাবা তোদের দেখে লোকে শিখবে, তাই তোদের বকি। তোদের মনগুলি যেন মাটির ঢেলা, সেগুলি নিয়ে তোদের ভেতর যে কাঁকর আছে ফেলে দিয়ে প্রভুর ভাবের বারিতে সিক্ত করে কুমোরের চাকে দেওয়ার আগে যেমন তাল তৈরি করে যোগাড় করে দেয়, তেমনি ধারা করি। তোদের প্রভুর চাকে তুলে দেব। তোদের অহংকার অভিমানগুলোকে পায়ে চটকিয়ে প্রভুর চাকে দেব। ঠাকুর তোদের ঘট জালা ইত্যাদি করে তুলবেন।' কিন্তু তাঁর সে কথা কি তখন বুঝেছিলাম! কিন্তু একটু বিনীতভাবে বোঝবার চেষ্টা করলেই দেখি সেই মানুষ একদিন চারুদাকে বকাবকি করে এসে পরে হাত জোড় করে বলছেন, 'বাবা তুমি নারায়ণ, তোমায় বুঝতে পারিনি, আমি শালা পাজি তাই তোমায় বকেছি, ক্ষমা কর বাবা, ক্ষমা কর।' চারুদা বলেছিলেন যদি সেদিন ও কথা না বলে তাঁকে জুতো মারতেন তাহলে ভাল হত। তাঁর শিক্ষার ধারাই অন্যরকম ছিল। তিনি বলতেন, 'তোদের কি শেখাই বাবা, তোদের শেখাতে গিয়ে আমি নিজেই শিখি। তোদের বলতে গিয়ে নিজের দিকেই তাকাই, নিজের গলদগুলো ধরা পড়ে।' কিন্তু তাঁর সেসব কথা কি বুঝতাম! তাঁর সম্মুখে তাঁর কথার প্রত্যুত্তর দিয়ে তাঁকে কতই না ব্যথিত করেছি। তিনি বলতেন, 'ওরে বাবা নিজেকে defend করিসনি। শেখ, শেখ।' তখন তো বুঝিনি। তাঁর কত দোষ দর্শনই না করেছি। চাঁদে ধুলি নিক্ষেপের ন্যায় তা

আমাদের নিজেদের মুখেই পড়েছে। চাঁদের তাতে কিছু হয়নি। চিরনির্মলে কি কলঙ্ক ধরে!

তিনি খাবার সময়ে কখন কখন গুনগুন করে গান ধরতেন। একটা বড় রকমের গলাওয়ালা গাইয়ে তিনি ছিলেন না বটে, কিন্তু সেই 'ভাবের মানুষ' নিজের ভাবে কত মাধুর্য বর্ষণ করতেন। ভাবলে হৃদয় ভরে যায়। কুটনোর সময়ে কুটনো কুটছেন আর গলা ধরলেন, 'তার নাগাল কোথায় পেলাম সই, ও যার জন্য ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল, পাগল বুড়ো শিব, তিন পাগলে যুক্তি করে ভাঙ্গল নবদ্বীপ। আর এক পাগল দেখে এলাম বৃন্দাবন মাঝে, রাইকে রাজা সাজাইয়ে আপনি কোটাল সাজে' ইত্যাদি। 'এ হাটে বিকায় না সুতো, বিকায় নন্দরানীর সুত' ইত্যাদি। ঠাকুরঘর থেকে ফিরে এসে কখন কখন গাইতেন, 'শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী-মা কি কল করেছে' ইত্যাদি। সেই ফোকলা দাঁতের ভিতর দিয়ে সব কথা হয়ত বেরুচ্ছে না, কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে গাইছেন, তা তাতেই কত মধু বর্ষণ হত। এখনকার মতো অত ওস্তাদি গানের কসরত, গানের ব্যকরণওয়ালা তিনি তো ছিলেন না, তা বলে তো আনন্দ কম দিতেন বলে মনে হয় না। আর আমরা আহাম্মুখ তার বিনিময়ে কত নিরানন্দই না তাঁকে করেছি। নিজেদের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে মদমত্ত ভবে দেখিয়ে কতই না যাতনা দিয়েছি।

সকলের জন্য তাঁর হৃদয় ব্যাকুল ছিল। অতিথিকে নারায়ণ-জ্ঞানে দেখতেন। একদিন বললেন, 'অতিথির্দুরোণসৎ' অর্থাৎ তিনি অতিথিরূপে গৃহে আসেন (কঠ উ. ২।২।২)। কিন্তু তখন সবে উপনিষদভাষ্যাদি পড়েছি, ভাবলাম মানেটা তো ঠিক হল না। তাড়াতাড়ি এসে শাংকর ভাষ্য খুললাম কারণ জানতাম অতিথি অর্থাৎ সোমরস রূপে 'দুরোণে' কিনা কলসে তিনি বাস করেন। কিন্তু বিধাতার এমনি ব্যাপার সেইখানেই ভাষ্যে আছে 'ব্রাহ্মণোঽতিথি-রূপেণ বা দুরোণেষু গৃহেষু সীদতীতি দুরোণসৎ' অর্থাৎ তিনি

ব্রাহ্মণ-অতিথিরূপে গৃহে অবস্থান করেন বলিয়া ছুরোণসৎ। তখন ভাবলাম হয়ত বা এটা কোন রকমে জেনে বলেছেন নতুবা আমাদের মতো এত ভাষ্যাদি তো পাঠ করেননি। এত মূর্খ ওই তিন পাতা পড়ে এত অহংকার বেড়েছিল তাই ভেবে এখন হাসি পায়। এটা ভাবিনি যে 'সভায় যো চলে' একটা কথা আছে, অর্থাৎ যদি শিক্ষা নিতে না পার তো সতের সভায় সঙ্গত হও। তাহলে সব শিক্ষা আপনি হবে। স্বামীজীর মতো শাস্ত্রনিষ্ণাত জ্ঞান-বিজ্ঞাননিষ্ণাত ব্যক্তির সাহচর্যে সমুদয় জ্ঞানরাশি যে তাঁদের মুঠোর মধ্যে ছিল তাকি বুঝেছিলাম! ভাবতাম আমাদের শিক্ষা দেওয়া তো উচিত আমরা ভদ্রলোকের ছেলে, কিন্তু শিক্ষা তো কিছু দিচ্ছেন না। পূর্বে শুনেছিলাম স্বামীজীর সময়ে পাঠের কত ব্যবস্থা ছিল কিন্তু এখন যত প্রহ্লাদ ক্লাস জুটেছেন আর আমাদের মাথাটা খাচ্ছেন। কেবল জল তোলান আর কুলির খাটুনি খাটান। স্বামীজীর আমলে এলে আমাদের মতো ছোকরাদের কত কদর হত, real training হত। পরস্পর বলাবলি করতাম যেমন মিশনারীরা লোকেদের এলে convert করে ছেড়ে দিয়ে তারপরে বলে, 'তুমি কি করিতে?' 'আমি মাছ ধরিতাম।' 'আচ্ছা উহাই উত্তম কার্য। প্রভুর ইচ্ছায় তুমি তাহাই করিতে থাক।' এঁদের দেখছি সেই ব্যাপার। আমরা যে যা করে এসেছি আমাদের দিয়ে তাই করাচ্ছেন। কিন্তু আমরা নিজেদের ত্রুটি ধরতে জানতাম না, জানতাম কেবল তাঁর দোষ উদ্ভাবন করতে। স্পষ্টই আমার মনে পড়ে মুখের উপর একবার বলেই ফেললাম, "আপনি যে বকেন, ভয়ে দূরে দূরে থাকি!' তখন হেসে বলেছিলেন, 'কত যে ভালবাসি তা বুঝি দেখিস না! কেবল বকুনিটাই মনে রাখিস! ওরে যাদের ভালবাসি তাদেরই বকি, অন্যকে নয়। তোরা ভাল ছবি বলেই না বলি বাবা, আমার এতে কি লাভ!' তখন তাৎকালিক তাঁর শুদ্ধ ভাবের নিকট নিজের হার স্বীকার করে নিয়েছি, কিন্তু

তারপরেই হয়ত বিস্মৃত হয়ে কত কষ্ট দিয়েছি। কথায় বলে 'স্বভাব যায় না মলে, ইল্লৎ যায় না ধুলে।' তাই হোতোও তাই। একবার আমায় বলেছিলেন, 'বাবা, মানুষ যারা জ্যান্তে মরা। তোদের জ্যান্তে মরা হতে হবে।' অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' ভাববিমুখ হয়ে—আচার্যপাদ শ্রীশংকর 'প্রেত্য অস্মাদ্ লোকাৎ'-এর ব্যাখ্যায় কেনভাষ্যে যা বলেছেন, 'মমাহংভাব-সংব্যবহার-লক্ষণাৎ ত্যক্ত-সর্বৈষণা ভূত্বা' অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' যে ব্যবহার তা থেকে মুক্ত হয়ে, সমস্ত বাসনাবিনির্মুক্ত হয়ে—থাকতে হবে। ছোট কথায় বলতেন তার অর্থ যে এত তা কি বুঝেছি! এখন বই পড়ে মনে করি কি কটমটে করে লোকে যাতে বুঝতে না পারে এমন ভাষায় অবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক ইত্যাদি না বলে বোঝালে শাস্ত্র তো বোঝান যায় না। ন্যায় তো পড়তেই হবে অন্যূন দশ বৎসর তা না হলে নব্যবেদান্ত তো পড়া হবে না, পণ্ডিত তো হওয়া যাবেই না। মনে ভাবি আর হাসি, বলিহারি বাবা বুদ্ধির কি দৌড়! আমার জনৈক গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করেছিলেন কতদিন পড়লে বেদান্তটা বেশ পড়া যায়। আমার ফর্দের বহর শুনেই তো তাঁর চক্ষু কপালে উঠে গেল, তবু তো তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত একজন ব্যক্তি। আমাদের ট্রেনিং দেওয়ার মানে মাথাটির দফারফা করে কটমটে বেদান্তী হতে বলা। heart এর তো কোন cultureই করতে নেই, ওগুলো তো sentimentalism ইত্যাদি। বলিহারি আমাদের শিক্ষাকতা! আমরা আবার আচার্যের স্থান নেব! অহংকারের এক একটা পাহাড় হয়ে মনে করছি না জানি কতই শিখে ফেলেছি। বিজ্ঞান-বিরোধী অজ্ঞানের আবরণ ভঙ্গ করাই বেদান্তের উদ্দেশ্যে তা তো চুলোয় গেল অজ্ঞানের মূলগ্রন্থি যে অহংকার অবিদ্যা যা থেকে বুভুক্ষিত হয়ে পরমপুরুষের তত্ত্বের আভাস পেতে হবে সেটাকে খুব আঁকড়ে বুকে ধরে থেকে মনে করি আচার্যের আসনে ভূষিত হব। অহো দুর্দৈব! এই রকম করেই কি আচার্য হব! তাঁরা তো আমাদের

মতো শ্লোক ঝেড়ে লোকেদের কর্ণ বধির করতে জানতেন না। তবে পণ্ডিত কি করে হবেন! মূর্খ, অতি মূর্খ তাই ভাবি এটা বোঝবার জন্য যে বুদ্ধির আবশ্যক সে বুদ্ধিরও তো অভাব দেখছি।

তিনি বলতেন, 'ওরে যারা এখানে আসবে, প্রভুর কাছে আসবে, একবার আসবে, তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করবি যেন তারা ভোলে না।' অপাত্র আমরা তাঁর কথার মর্ম বুঝিনি। তাই 'উলটো সমঝলি রাম' হল। শিব গড়তে বাঁদর গড়লুম। ব্যবহার করলাম ঠিকই, তারা ভুলতে পারলে না তাও ঠিক কিন্তু কোন দিক দিয়ে সেটাই হল কথা। তিনি বলেছিলেন, 'এমন আপনার করবি যে জীবনে তাদের আপনার জন বলে ভুলতে পারবে না।' কিন্তু আমরা উলটো বুদ্ধি করলুম, কিনা চির পর তাদের করলাম। এমন ব্যবহার করলাম তারা কখনও সেই দুর্ব্যবহার ভুলতে পারবে না। চিত্তশুদ্ধি না হলে উপদেশ দিলে যে কাজের হয় না এটা খুব সত্য কথা। এই প্রসঙ্গে উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচনের গল্পটা মনে পড়েছে।

মঠে আহারান্তে মশলা দেবার ব্যবস্থা ছিল। আমি দীর্ঘকাল এই সেবার অধিকার পেয়েছিলাম। অন্যান্য কাজের মধ্যে এটা একটা অতি সামান্য কাজ অথচ এই উপলক্ষ্যে সবার সঙ্গে একটা দেখা-সাক্ষাৎ হবার সুযোগ হত। আর কার অসুখবিসুখ করেছে তাও জানা যেত। কিন্তু তখন আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি এতই কম ছিল যে কারও খাওয়া হয়েছে কি হয়নি তার খবর না নিয়েই সাধারণ পঙ্গতের পরেই যথাকালে মশলা দিতে যেতাম। এই মশলা দেবার সময় পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকেও দিতাম। একদিন তাঁর শরীর অসুস্থ ছিল। তিনি কিছু খাননি। প্রত্যহ বৈকালে এক গ্লাস জল খাওয়ার পরে তিনি আমার কাছ থেকে দুই-একটি লবঙ্গ নিতেন। সেদিন যথাসময় আমি লবঙ্গ নিয়ে গিয়ে দিতে গেছি এই মনে করে বুঝি জল খাওয়া তাঁর হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি

বিরক্ত না হয়ে একটু সহাস্য দৃষ্টিতে করুণভাবে আমার দিকে তাকালেন। আমি কিছু বুঝতে পারলাম না দেখে বললেন, 'বেশ বাবা বেশ, খেলুম কি খেলুম না সেটাও বুঝি খোঁজ নিতে নেই।' এমনি সেবাপরাধ, কতই অপরাধ করেছি মনে করলে প্রাণ ফেটে যায়, চোখে জল আসে। প্রার্থনা করি, প্রভু আমার অপরাধ নিও না।

আমি তাঁর শরীরে ভাবাবেগ বহুবার তাঁর কৃপায় দেখেছি, কিন্তু কখন চোখে জল দেখিনি। শুনেছি শ্রীশ্রীমহারাজের চোখে জল দরদর করে পড়েছে। শুনেছি হরি মহারাজের মুখে যে স্বামীজী শশী মহারাজের অনুরোধে একদিন ঠাকুরকে ভোগ দিতে গিয়ে যখন ঠাকুরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'ইয়ার, এই নাও খাও' তারপর এসে শ্রীশ্রীমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করেছিলেন। তখন ডুকরে ডুকরে তিনি কেঁদেছিলেন। আরও স্বামীজীর কান্নার সম্বন্ধে অনেক শুনেছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ স্থূলভাবে অপ্রকট ভাব ধারণ করার পরে, বাবুরাম মহারাজের মুখে শুনছি, বহুবার শুনেছি, স্বামীজী প্রত্যহ সারারাত ঠাকুরের জন্য এত কাঁদতেন যে চোখের জলে বালিশ ভিজে যেত। ভগবৎপ্রেমে বাবুরাম মহারাজের মুখ চোখ লাল হয়ে যেত এটা বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি ভাবের ঘোরে মাতালের মতো টলছেন তাও দেখেছি। 'কৃপা' 'কৃপা' বলে উন্মত্ত হয়ে, 'গুরু কৃপা' 'গুরু কৃপা' 'জয় গুরু' 'শ্রীগুরু' 'জয় প্রভু' 'জয় প্রভু' 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' বলে মত্ত হয়ে যখন মধ্যে মধ্যে হুঁকার দিতেন, তখন তাঁর শ্রীমুখের অপূর্ব ভাব নিরীক্ষণ করার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু চোখে জল কখন দেখিনি। একবার মনে পড়ছে মঠে গঙ্গার দিকের বারান্দায় চুপ করে বসে গঙ্গা দর্শন করছেন, তাঁর বুকটা খোলা, লাল হয়েছে, দেখলে মনে হবে পিঁপড়ে কামড়েছে। তাই দেখে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে?' তিনি কিছু বললেন না। তখন বুঝিনি। এখন মনে হয় ভাবে তাঁর বুকটা লাল হয়েছিল।

তিনি একবার গণেশের মন্ত্র 'গং' বীজে করতে হবে একথা তিনি

পূজা করতেন তাঁকে শিখিয়েছিলেন। আমি মনে করলাম উনি তো মন্ত্র এত জানেন না তবে বোধ হয় গণেশের মন্ত্রটা জানেন। সব বিষয়ে নির্বুদ্ধিতাবশতঃ নিজেকে তাঁর চেয়ে বুদ্ধিমান ঠাউরেছি। এসব ভাবলে এখন হাসি পায়।

আমি যখন ব্রহ্মচারী ছিলাম তখন মহাপুরুষের আদেশে ঠাকুরের পূজায় ব্রতী হই। কেষ্টলাল মহারাজ সেটা পছন্দ করতেন না। তিনি প্রথমতঃ শ্রীশ্রীমহারাজকে ঐ কথা নিবেদন করেন। কিন্তু সেখানে বড় সুবিধা হল না দেখে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে বলেন। তিনি তখন অসুস্থ। পূর্ববঙ্গ থেকে ফেরার পর সবে অসুখ করেছে। ১৯১৭ সাল। কেষ্টলাল মহারাজের কথা শুনে তিনি আমায় ডেকে পাঠালেন। আমি পথে যেতে যেতে ভাবছি, তাইতো যদি জিজ্ঞাসা করেন কি জবাব দেব। তখন হঠাৎ মনে পড়ল শ্রীশ্রীমাঠাকরুনের কৃপার কথা। শ্রীশ্রীমাকে আমি আগে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'মা, আমি মন্ত্র-তন্ত্র সব উচ্চারণ করে পূজাদি করতে পারি কি?' শ্রীশ্রীমা তার উত্তরে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ বাবা সব পার। তোমাদের সব মন্ত্র-তন্ত্রে অধিকার আছে। সব পার।' তখন হঠাৎ সেই কথাটার উপর জোর দিয়ে মনকে দৃঢ় করে বুক ফুলিয়ে চললাম। ভাবলাম যদি জিজ্ঞাসা করেন তবে ঐ জবাবটা দেব, কি বলেন দেখি! প্রাতে ৯/১০টার সময় বলরাম মন্দিরে উপস্থিত হলুম। দেখি উপরে উঠেই যে ছোটঘর সেই ঘরে তিনি শুয়ে আছেন। আমায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছিস?' পরে বললেন, 'তুই নাকি ঠাকুরের পূজা করছিস?' তিনি ঐ কথা বলামাত্র আমি সেই কথাটা যা ভেবেই এসেছি সেটা বুক ঠুকে বলে ফেললাম। সে কথার উত্তরে আর কোন কথা বললেন না। চুপ করে রইলেন। বুঝলাম শ্রীশ্রীমায়ের কথার উপর কথা কইলেন না। নতুবা ব্রাহ্মণের ছেলে ভিন্ন আর কেউ ঠাকুরের পূজা করেন, এটা তাঁর তত ইচ্ছা নয়, অন্ততঃ ব্রহ্মচারী অবস্থায়।

আমাদের মঠের যিনি মা তাঁকে আমি নিভৃতে প্রভু বলে ডাকতাম একদিন প্রভুর কাছে বললাম, 'প্রভু এত বকেন যে কাছে আসতে ভয় হয়।' তিনি আদর করে গলা জড়িয়ে বুকে আঁকড়ে বললেন, 'আর এটা, এই ভালবাসাটা মনে হয় না! কত যে ভালবাসি সেটা বুঝি দেখিস না! ওরে যাকে ভালবাসি তাকেই তো বলি। আর কাকে বলি বল! ভালবাসলেই বলে। স্বামীজীও বলতেন, "আমি যাকে যত ভালবাসি তাকে তত বকি, গাল দি। তাইতো রাজার ওপর এত জোর।" '

'স্বামীজী একবার মঠে নিয়ম করেছিলেন যে দ্বিপ্রহরে কেউ ঘুমাতে পাবে না। আমি বাগানে কাজকর্ম করে এসে খেয়ে-দেয়ে দুপুরবেলা ঘুমুচ্ছি। স্বামীজী এসে আমায় জোর করে বিছানা থেকে ফেলে দিলেন। আমি তো লজ্জায় ধড়মড় করে উঠে পড়লুম। কিন্তু স্বামীজী তার কিছুক্ষণ পরেই কানাই মহারাজকে দিয়ে আমায় ডেকে পাঠালেন। আমি যেই স্বামীজীর ঘরে গেছি আর অমনি স্বামীজী একেবারে আমার পায়ের উপর পড়ে কান্না। আমি একেবারে অবাক্। একি কাণ্ড! আমি যত বলি, "স্বামীজী করছ কি ভাই, স্বামীজী করছ কি ভাই!" তিনি ততই বলেন, "ভাই, ঠাকুর তোদের কত ভালবাসতেন, আর আমি কি করছি বল দিকি, কত কষ্ট দিচ্ছি বল দিকি! তা ভাই, তোদের বলব না তো বলব কাকে! তোদের উপর জোর করব না তো করব কার উপর! আমার ধকল সইবে কে ভাই!" এই ঘটনার উল্লেখ করে প্রভু বলতেন, 'স্বামীজীর কি ভালবাসা, তা কি মুখে বলে বোঝান যায়!'

শ্রীশ্রীস্বামীজী যে তাঁর গুরুভাইদের উপর অত জোর করতেন, আবদার করতেন, সময় সময় স্থূল দৃষ্টিতে কর্কশ ব্যবহার করতেন সেটা কেবল তাঁদের বকার উদ্দেশ্যে নয়। তাঁর সকল কর্মই লোককল্যাণার্থ, তিনি দেখতেন ঐ দোষগুলি তাঁর গুরুভাইয়েরা ও

শিষ্যরা না করেন এবং সাবধান হয়ে যান যাতে শিষ্য-প্রশিষ্য-ক্রমে ঐ শিক্ষা ধীরে ধীরে সাধারণের মধ্যে গিয়ে পড়ে। স্বামীজী ছিলেন সমদর্শী। তিনি দোষ দর্শন করে তাঁর গুরুভাইদের বকতেন, তা তো হতে পারে না। তাঁর ভর্ৎসনার গভীর উদ্দেশ্য ছিল। সেটা তাঁর নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। নতুবা তিনি গীতা পড়াতে গিয়ে ঐ অমূল্য বাণী কেন দিয়েছিলেন, 'ঘৃণা কাউকে করো না। কাউকে নয়—মহাপাপাকেও নয়।' পূজনীয় সুধীর মহারাজের মুখে শুনেছি ঐ কথা বলতে বলতে স্বামীজীর মুখ চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল, কি একটা দিব্যভাবে তিনি পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আরও শুনেছি একবার পূজনীয় শরৎ মহারাজ পূজনীয় হরি মহারাজ যে মাদুরে বসে আছেন সেই মাদুরের উপর জুতো পায়ে দিয়ে বসে আছেন। তখন বিলেত আমেরিকা ঘুরে আসার পর পূজনীয় শরৎ মহারাজ খুব পরিষ্কার থাকতেন। সর্বদা ফিটফাট। সর্বদা পায়ে জুতো পরতেন, সব বিষয়েই পরিপাটী, সুশৃঙ্খল ও সাফ্‌সুদ্দুর। তখন সেইভাবেই চলছেন, ওদেশ থেকে ফিরে এসেও কিছু বদলায়নি, অন্ততঃ জুতো পরে যেখানে সেখানে যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে। এইটি লক্ষ্য করে এবং বিশেষ করে গুরুভাইদের সামনে অমন করে জুতো পায়ে দিয়ে এক আসনে বসতে নেই, এ দেশে ওটা প্রচলিত নয়, সুতরাং জগতের যাঁরা গুরু, আচার্য স্থানে আসীন হবেন তাঁদের পক্ষে ঐরূপ অতি সামান্য বিষয়েও যাতে ত্রুটি না থাকে, একেবারে নিখুঁত হয় (কারণ তাঁদের প্রত্যেক আচরণটিই তো অনুকরণীয় এবং লোককল্যাণার্থ) তাই স্বামীজী একদিন ধমক দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে শরতা, (ঐ বলেই স্বামীজী তাঁকে ডাকতেন) ওরা (আমেরিকাবাসীরা) তোকে কি বশ করেছে? কিছু কি শুঁকিয়ে দিয়েছিল যে একেবারে সব ব্যাপারে ওদের মতো হয়ে গেছিস?' পূজনীয় শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছেই শিক্ষা পেয়েছিলেন যখন যেটা করতে হবে সেটা সম্পূর্ণ মন প্রাণ দিয়েই

করতে হবে। তাতে বিন্দুমাত্র এদিক ওদিক যেন না হয় দেখতে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরও খৃষ্টান মুসলমান ধর্মসাধনকালেও তো তাই করেছিলেন। একেবারে তাদের নিয়মকানুন রীতিনীতি যেমন আছে, অতি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও সেইরূপ মেনে চলা ঠাকুরের অভ্যাস ছিল। তাই পূজনীয় শরৎ মহারাজও ঐরকম করতেন। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে ঠাকুর সামাজিক রীতিনীতির অনুকরণ তো করতে বলেন নি। বস্তুতঃ ঠাকুরের ভাব স্বামীজী যেমন বুঝতেন এমন আর কেউ নয়। তাই স্বামীজী ঐ বিষয়ে পূজনীয় শরৎ মহারাজকে সাবধান করে দিলেন এবং তার দ্বারা আমাদেরও সাবধান করে দিলেন। তাইতো বাবুরাম মহারাজ বলতেন, 'ওঁকে (স্বামীজীকে) যে গুরু বলে মানি সে যে ঠাকুরই ওঁকে গুরুর আসনে বসিয়ে গেছেন। ঠাকুর যে আমাদের দেখবার ভার ওঁর হাতে দিয়ে গেছেন।'

একদিন বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন, 'ওঁ সচ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্।'

জ্ঞান মহারাজকে তিনি বলেছিলেন, 'অমন করে ঠাকুরের নাম যেখানে সেখানে করে! শুকদেব নিজ ইষ্ট শ্রীমতীর নাম পর্যন্ত নিলেন না।'

তিনি বলেছিলেন, 'ঠাকুর যখন এসেছেন তখন সত্যযুগ পড়েছে।'

তিনি আমায় বলেছিলেন, ' "যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ রে"—যে ঠাকুরকে ভালবাসে সেই তোর প্রাণ হোক।' প্রার্থনা করি তাঁর এই বাণী আমার জীবন-নদীতে ঢেউ খেলে নৃত্য করুক।

বাবুরাম মহারাজের মহাসমাধির সময় আমি কাশীতে ছিলাম।

শরৎ মহারাজ

পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ বলতেন, 'আছে বস্তু, নেই কাল।' ১৯১৫ সালে যখন আমরা দুর্ভিক্ষের ত্রাণকার্যে যাই তখন তিনি এই কথাটি বলেছিলেন।

যখন আমায় সকলে পাগল বলেছিল তখন একদিন অভিমান-ভরে শরৎ মহারাজকে বলেছিলাম, 'মহাশয়, কালী মহারাজ বলেছেন মাথা ঠিক আছে তো?' তাই শুনে তিনি বলেছিলেন, 'ওরে, ঠাকুরকেও লোকে পাগল বলেছিল। তুই ভাবছিস কেন? লোকের আবার কথা!'

আর একদিন বলেছিলেন, 'খুব ভক্তি বিশ্বাস হোক। দেখবি, দেখবি কত লোক এসে জুড়োবে। শান্তি পাবে।'

অন্য একদিন যখন শুধাংশু কুণ্ডুকে তাঁর কাছে দীক্ষা নেবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন, 'তুই দে-না।' আমি মনে করলাম বুঝি ঠাট্টা করছেন। তারপর আমি বললাম, 'মহাশয়, আপনারা থাকতে আমি?' তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আমি বসে থাকব, তুই দিবি।' তারপর আর একদিন দিতে বলেছিলেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই বলেছিলেন। তারপর একদিন তাঁকে যখন পুরীতে রথযাত্রার সময় জিজ্ঞাসা করলাম, তখন মন্ত্রাদি সম্বন্ধে অনেক কথা হয়েছিল। সে সময় তিনি নিজে রথের দড়ি টেনেছিলেন। আর রথে জগন্নাথ দর্শন করেছিলেন রাত্রিবেলায়। আমরা সঙ্গে ছিলাম। আমাদের সকলকে অতিক্রম করে আগে গিয়ে সেই ভিড়ের ভিতর দর্শন করে ফিরে এসেছিলেন। তারপর আমরা গিয়েছিলাম। যাবার সময় তিনি গাছকোমর বেঁধে গিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে যেন একটা মোটা ছেলে যাচ্ছে বলে মনে হয়েছিল।

কাশীর অন্নপূর্ণার পাণ্ডার সিঁদুরের টিপ দেবার সময় তিনি তাঁর গদির সামনে মাথা নত করেছিলেন। দেখে আমিও প্রণাম করেছিলাম। 'যার যা ভাব সেই হয় উত্তম'।

একদিন ঠাকুর আর স্বামীজীর স্তবসংবলিত কয়েকটি শ্লোক নিয়ে শরৎ মহারাজকে দিলে, তিনি বললেন, 'বেশ বেশ। দ্যাখ্ ঠাকুরকে শুনিয়ে আসি।'—এই বলে তড়াক করে ঠাকুরঘরে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, 'ঠাকুরকে শুনিয়ে এলুম।' পরমানন্দ-

স্বামীরও ঐরকম হত শুনেছি। হঠাৎ অনুপ্রেরণার বশে তিনি কাজ করতেন।

একদিন তাঁকে বলেছিলাম, 'দেখুন প্রভু, ঠাকুর আমাদের মালিক। বেদে তাঁর এক মন্ত্র পেয়েছি "ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে" ইত্যাদি—অর্থাৎ সকল দলের (সকল আধ্যাত্মিক ভাবের দল) দলপতি হলেন প্রভু। তাঁকে আহ্বান করি। রত্নের মধ্যে নিধি অর্থাৎ রত্নস্বরূপ তিনি। প্রিয় বস্তুর মধ্যে পরম প্রিয় বস্তু তিনি। হে বসো অর্থাৎ ধন তুমি আমার। *

পূজনীয় শরৎ মহারাজ ১৯২৩ সালে ঠাকুরের তিথিপূজার দিন কাশীতে আমাকে অভিষিক্ত করেছিলেন। কাশীর যোগী মহারাজও আমার সঙ্গে একইদিনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তিনি উডল্যাণ্ডে শৌর্যেন্দ্রবাবুর অভিষেকের দিন বলেছিলেন, ঠাকুর স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে শাস্ত্রানুসারে অভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, 'তোমার এত দরকার কি? সংকল্পমাত্রেই তো হয়।' মাস্টার মশাই (গদাধর আশ্রমে) আমাকে বলেছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে ও বাবুরাম মহারাজকে অভিষিক্ত করেছিলেন।

শৌর্যেন্দ্রবাবুর অভিষেকের দিন পূজনীয় শরৎ মহারাজ আমায় শ্রীচক্রে বসিয়েছিলেন। কপিল মহারাজের তাতে আপত্তি ছিল। সেভাব প্রকাশ করায় আমায় পুনরায় অভিষেক নিতে হল।

তিনি আমায় কাশীতে মহানির্বাণ ও প্রাণতোষিণী এবং জগন্মোহন পূজাপদ্ধতি দেখতে বলেছিলেন।

---

* ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে। নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে। প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে। বসো মম। (কৃষ্ণযজুর্বেদ, অশ্বমেধ গ্রন্থ ৪।১। বসো মম, শব্দ দুটি বাদ দিয়া মন্ত্রটি শুক্ল ও কৃষ্ণযজুর্বেদেও আছে যথা শুক্লযজুঃ ২৩।১৯ এবং কৃষ্ণযজুঃ কঠ শাখা ১০।১৩। ঋগ্বেদে আছে মাত্র এই অংশটুকু যথা, গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে, ঋ ২।১৩।৪।)

কাশীতে ১৯২৩ সালে টিলায় চারুবাবু ৺কালীপূজা করান। সেই-বার শরৎ মহারাজের নিকট যখন অনুমতি চাইতে গেলাম তিনি বল-লেন, 'যখনই ঐসব শুভকর্ম করবি, জানবি আমাদের অনুমতি আছে।'

শ্রীশ্রীমহারাজের তিরোধানের পব শরৎ মহারাজকে একদিন তাঁর ঘরে বসে বলেছিলাম, কাশীতে যখন তিনি বিশ্বনাথ দর্শন করতে যেতেন, তখন তাঁকে দেখে বোধ হত যেন ঢুণ্টি গণেশ। তিনি চট্ করে বলে উঠলেন, 'আর দেখ, আমাদের মহারাজ চলে গেলেন, আর মঠে যেতে ইচ্ছা করে না, কার কাছে যাব!'

· শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি নিজের খাটের উপর বসে শরৎ মহারাজ একদিন বলেছিলেন, 'ওরে আমাদের ইচ্ছা ছিল এক একজন ঠাকুরের এক একটা ভাব নিয়ে মেতে থাকব। সেইজন্য যদি কাউকে খ্রীস্টান হতে হয়, কি মুসলমান হতে হয় তাও হব। আর ঠাকুরের এই উদার মতবাদ তার ভিতর দিয়ে প্রচার করব, কিন্তু তা বাপু আর হল না। শেষে এই যা হল তা তো দেখছিস।'

আমি একদিন প্রসাদ নিয়ে গিয়েছিলাম। সামান্য প্রসাদ তাই কত আনন্দ করে খেলেন এবং সবাইকে বললেন, 'ললিত বাবাজী প্রসাদ এনেছে, প্রসাদ এনেছে।' সকলকে ভাগ করে দিলেন।

তিনি যেদিন মহাসমাধিতে মগ্ন হন, সেদিন কিছু আগেই আমি ও অমৃতেশ্বরানন্দ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে আসি। সেদিন পরেশ মহারাজ (অমৃতেশ্বরানন্দ) গদাধর আশ্রমে ছিলেন। সহসা খবর পেয়ে তিনি ও আমি একসঙ্গে দর্শন করতে যাই। যেন কৃপা করে দেহরক্ষার পূর্বেই আমাদের দর্শন দিলেন।

হরি মহারাজ

হরি মহারাজের মুখে শুনেছি যে তিনি প্রথমে কুলগুরুর কাছ কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে সাধনভজন করতেন। সহসা ঠাকুর একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হ্যাঁরে, তুই এই মন্ত্র জপ করিস তো?

তাতে তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ'। তখন ঠাকুর সেটি একটু অদল বদল করে দিয়েছিলেন।

আমার মুখে চণ্ডীপাঠ শুনে তাঁর চক্ষু দিয়ে অনর্গল ধারা বয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'ওরা তো আমার শরীরের সেবা করে। তুমি আমার আত্মার সেবা করছ। কত আনন্দ হচ্ছে।' আমি বলেছিলাম, 'মহারাজ, আমি সাধুসেবা করতে পারলাম না।' তাতে তিনি ঐকথা বলেছিলেন। তারপর তিনি যখন বৈকালে জলখাবার খাচ্ছিলেন (মদনঘরের পাশে যেখানে উনুন আছে) বললেন, 'এক টুকরো পেঁপে আমায় দাও।' তিনি হাত পেতে আমার কাছ থেকে পেঁপের টুকরো নিয়ে বললেন. 'এইতো সাধু সেবা করা হল। তুমি বুঝি জান দুধ দিলে আর ওষুধ খাওয়ালেই সেবা করা হল।'

তিনি বলেছিলেন, 'তুমি জান আর না জান তুমি তা-ই।' আমি একদিন জেদ ধরেছিলাম, বলেছিলাম, 'মহাশয়, spirituality (আধ্যাত্মিকতা) তো impart (প্রদান) করা যায়।' তাতে তিনি প্রথমে স্থির হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'ঠাকুর পারতেন; তবে এই হাত দিয়ে তিনি অনেককে কৃপা করেছেন। ললিত, তোমাকে এখনই এক শ' দৃষ্টান্ত দিতে পারি। তবে কি জান, জোর করলে শরীরে ধকল আসে। এখন শরীরের সে সামর্থ্য নেই।' তারপর তিনি দাড়ি কামাতে গেলেন। ধ্রুবেশ্বরানন্দ কামাতে লাগল। আমি সেখানে তাঁর কাছে গেলে তিনি ঈষৎ হাস্যভরে বললেন, 'কি জান ললিত, আমি যাদের ভালবাসি তাদের ভিতর আমার ভাব যাবে।' তারপর তিনি একদিন ভাগবত ক্লাসের পর সকলকেই কোন কারণে বকেছিলেন। তারপর আমায় বিমর্ষ দেখে বলেছিলেন, 'তোমার বড় লেগেছে না? লাগবার জন্যেই তো বলেছি। যতদিন বাঁচব ততদিন বলব। তোমায় যে ভালবাসি।' সেই কথা শোনামাত্র আমার হৃদয়ের সকল ব্যথা চলে গিয়েছিল।

কাশীতে একদিন বলেছিলেন, 'ললিত, তোমায় প্রথম দেখেই

বুঝেছিলাম তুমি ঘরে থাকতে পারবে না।' একদিন যখন খেদ করে বলেছিলাম, 'মহাশয়, কিছু তো বুঝতে পারলুম না।' তখন তিনি বলেছিলেন, 'সেকি বলছ? সেই আট-দশ বছর আগে একদিন আমায় বলেছিলে, "ভগবানকে ডাকলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।" সেকথা এখনও আমার মনে আছে। সুতরাং ওসব কথা বলা তোমার সাজে না।'

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে পূজনীয় শরৎ মহারাজের নিকটও একদিন খেদ করে ঐরূপ বলায় তিনি তো একেবারে আমায় কাঁদিয়ে ছেড়েছিলেন। বলেছিলেন, 'কি বলছিস! তোরা মহারাজ, বাবুরাম মহারাজকে দেখে এই কথা বলছিস! তবে বুঝি ঠাকুরকে মানিস না!' আমি তখনি কেঁদে ফেলে বললাম, 'না তা বলছি না।'

শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠের পর ভাগবত গ্রন্থটি মেঝের যেখানে বসতাম সেখানে রাখতাম। তাই দেখে হরি মহারাজ বলেছিলেন সতীশ মহারাজকে, 'ললিতের কাণ্ড দেখছ! আমার বুক ভয়ে কাঁপে, দুড়দুড় করে। যারা বেদকে 'ব্যাদ' বলেন এবং ন্যায়শাস্ত্রের মহিমায় মুগ্ধ বলিহারি যাই তাদের শাস্ত্রবিশ্বাস! ধন্য কলির প্রভাব!'

একদিন শ্রীমদ্‌ভাগবত পড়তে পড়তে শেষকালে বলেছিলাম, 'আমি এইবার ধ্যান করব (বিমল প্রভৃতি করত দেখে)।' তিনি বলেছিলেন, 'বেশ তো।' তারপর আর যাওয়া হয়নি। তাঁর কাছ থেকে হরিদ্বার যাব ঠিক করেছিলাম কারণ বেরিয়েছিলাম হরিদ্বার যাব বলে। তারপর মনে হল হরিদ্বার তো আছেন কিন্তু এঁদের দেখা কোথায় পাব! হরি মহারাজ বলেছিলেন, 'দেরাদুন যাব।' তাতে আমি বলেছিলাম, 'কাশী ছেড়ে কেন দেরাদুন যাবেন?' তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন, 'কাশী আমরা করতে পারি।'

হরি মহারাজ আমায় লিখেছিলেন, 'তোমার ঘরের কোণে মধু রয়েছে, তুমি আবার এদিক ওদিক যাও কেন!' ঘরের কোণে মধু রয়েছে অর্থাৎ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ রয়েছেন।

হরিমহারাজের উপদেশ—' "Shut the closet before you pray." ভাব যত চাপবে তত বাড়বে।'

পূজনীয় হরি মহারাজের তিরোধানের সময় (২১শে জুলাই ১৯২২) আমি গদাধর আশ্রমের ভার নিয়েছি কয়েকদিন মাত্র।

মাস্টার মহাশয়

মাস্টার মহাশয়কে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করাতে ঘোরতর আপত্তি করে বলেছিলেন, 'তোমরা প্রণাম করলে গৃহস্থেরা ভাববে যে গৃহস্থ এত বড় হয় যে সন্ন্যাসীরও প্রণম্য হয়।' আমি যখন বলেছিলাম, 'মহাশয়, আপনাদের তো গুরুজন বলে মনে করি।' তাতে বলেছিলেন, 'মনে মনে সে ভাব থাকা ভাল, বাহিরে এই শেকহ্যাণ্ড ইত্যাদি ভাল।'

১৯২৪ সালে গদাধর আশ্রমে থাকাকালীন মাস্টার মহাশয়কে বিছানা করে দিয়েছিলাম। তিনি বিছানা গুটিয়ে রেখেছিলেন, 'তুমি সন্ন্যাসী, তুমি বিছানা করে দিলে সেই বিছানায় আমি গৃহস্থ হয়ে কেমন করে শোব!'

তিনি একদিন আমায় বলেছিলেন, 'তোমার এই যে অবস্থা একে ভাব বলে। ঠাকুর থাকলে স্থূল শরীরে আজ কত আনন্দ করতেন। তুলোর বাকসোয় যেমন সযত্নে আঙুর রাখে তেমনিভাবে এই ভাব তোমার রক্ষা করা উচিত।'

একদিন খেতে খেতে মাস্টার মহাশয় আমাকে বলেছিলেন, 'আমার মনে হচ্ছে ঠিক যেন বাবুরামের কাছে রয়েছি।' সেকথা শুনে আমার মনে হয়েছিল যে আমায় দেখে তাঁর কথা মাস্টার মশাই-এর হৃদয়ে জাগরূক হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—'তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকা' অর্থাৎ প্রেমাস্পদ শ্রীভগবানের ভাবনা করিতে করিতে ভগবানের আবেশ হইয়া থাকে।*

* ভাঃ ১০।৩০।৪৩ গোপীগণের চিত্ত কৃষ্ণগত, তাহাদের আলাপ ও চেষ্টা কৃষ্ণবিষয়ক, সুতরাং তাহারা কৃষ্ণময়ী হইয়াছিল।

মাস্টার মহাশয়ের কথা —'We live in eternity. "Man does not live by bread alone. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me." '

মাস্টার মহাশয় বলেছিলেন, 'মনকে মাঝে মাঝে ছড়িয়ে দিতে হয়।'

১৯২৪ সালে কোন সময় মাস্টার মশাই এই গানটি আমায় গেয়ে শুনিয়েছিলেন :

প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী
প্রেমের দ্বারে আছে দ্বারী
করে মোহন বাঁশরী
বাঁশী ডাকছেরে সদাই, প্রেম বিলাবে কল্পতরু রাই
কারু যেতে মানা নাহি। ডাকছে বাঁশী আয় পিয়াসী
রাধা বইকো নাইকো আমার
রাধা ব'লে বাজাই বাঁশী
দে গোবিন্দ আমায় দে যোগী সাজাইয়ে
দে গোবিন্দ ভস্মমাখি ভৃগুপদ চিহ্ন ঢাকি
আর যাবো নাকো সই যমুনার জলে
ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়ন সলিলে।

খোকা মহারাজ

খোকা মহারাজকে কেমন করে ভক্তি লাভ হয় জিজ্ঞাসা করায় বললেন—'ভক্তিলাভ করতে হলে আন্তরিক প্রার্থনা চাই, ঠেকো মারার কর্ম নয়। লোকে জানছে বেশ জপ করে, ধ্যান করে এমন ধারা হলে হবে না। মন রয়েছে একদিকে অথচ জপ করছি, ধ্যান করছি, এসবে হয় নাকো। দুনৌকায় পা দিলে ডুবে যেতে হয়।'

'তাঁর নাম করতে করতে ডুববে, তাঁর নাম করতে করতে উঠবে। আর যাবে কোথায়।'

ওঁ নমো নারায়ণায়

২৫শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার বলরাম বাবুর বাড়িতে মহারাজ ছিলেন, দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁর জন্য খানিকটা দুধ নিয়ে গিয়েছিলাম। সুবোধ মহারাজ সেখানে ছিলেন—আমার পরিচয় দিলেন। ঐ দিন ইচ্ছা ছিল মহারাজের নিকট দীক্ষা নেব। কিন্তু সেখানে বড় হট্টগোল। মহারাজ বললেন—'মঠে যাবে।' অবশ্য আমার মনোভাব তাঁকে প্রকাশ করিনি। একব্যক্তি তাঁর হাত গুনে বলল যে, তিনি এখনো দীর্ঘকাল বাঁচবেন আর তাঁর উন্নতি হবে। তিনি বললেন 'আর কিসের উন্নতি হবে, ধর্মের উন্নতি ছাড়া!' মহারাজ বললেন, 'তা বই কি। তাছাড়া আর উন্নতি কিসে! যেখানেই থাক, ভগবানকে নিয়ে থেকো। বাবা মাকে সেবা দ্বারা প্রসন্ন করলে ভগবান তুষ্ট হন।'

শুক্রবার রাত্রে যেন মহারাজকে স্বপ্নে দেখলাম, মন্ত্র দিলেন। তারপর দিন বৈকালে মঠে গিয়েছিলাম। তাঁর জন্য এক শিশি মধু নিয়ে গিয়েছিলাম। পূজনীয় হরি মহারাজের একখানা চিঠি সকালে পেয়েছিলাম। তিনি অবসর মতো মঠে যেতে লিখেছেন। শ্রীশ্রীমহারাজকে স্বপ্নের কথা বলেছিলাম। তিনি বললেন—'বেশ খুব ভাল, খুব জপ কর।' মহারাজের সেবা করছিলাম, তার পরে তাঁর সঙ্গে ঐ কথা হয়েছিল। সেবান্তে ভিসিটার্স রুম-এ এসে দেখলাম পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ কথাবার্তা বলছেন। তাই দেখে সেখানে বসে গেলাম। তিনি অনেক কথা বললেন, তার সারসংক্ষেপ এই যে, ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা চাই, না হলে কিছুই হল না। প্রার্থনা করতে হবে, 'প্রভু আর কতদিন এমনভাবে রাখবে!' কাঁদতে শিখতে হবে তবে তো তাঁর দয়া হবে, তিনি দেখা দেবেন। তাঁকে চাইতে হবে, জোর করতে হবে, হচ্ছে-হবের কর্ম নয়। খাচ্ছি-দাচ্ছি বেশ রয়েছি, সময় মতো একটু আধটু ডাকছি, এর কর্ম নয়। তাঁকে

রাত, রাতকে দিন করে ফেলতে হবে। খুব জোর করতে হবে, খুব রোক করতে হবে—'প্রভু দেখা দাও, না হলে বলছি হবে না।' তবে তাঁর কৃপা হবে। কৃপা না হলে কিছুই হয় না। কৃপাই আসল জিনিস। সবকথার শেষাশেষি বললেন—'তাঁর শরণাগত হতে হবে, না হয় খুব পুরুষকার চাই। দুটোর একটা চাই। কিছুই নেই সেটা বুঝতে হবে তমোগুণের লক্ষণ। একটা ভাব দৃঢ় করতে হবে। আমরা ঠাকুরের, আমাদের সব পাশ কেটে গেল। সব বন্ধন খুলে গেল। আমরা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। আমাদের আবার কিসের সাধন! সাধন যাদের করতে হয় করুকগে।'

প্রথম প্রথম যখন মঠে যেতাম তখন শ্রীশ্রীগুরুদেব একদিন বলেছিলেন, 'তিনিই উপায় এবং তিনিই উদ্দেশ্য। অনেক দিনের পুরানো ভৃত্যকে বাবু ভালবেসে একদিন বললেন—"ওরে, তোর বাড়িতে যাব।" তারপর যাবার আগে তার বাড়িতে যাবার সাজসরঞ্জাম সব পাঠিয়ে দিলেন। তারপর হঠাৎ একদিন তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন, তারপর তাকে হয়ত কাছে বসালেন আর বললেন—"ওরে তুইও যা আমিও তাই।" এই রকম যা করবার সব তিনিই করিয়ে নেবেন। তাঁর কাজে লেগে থাকো।'

কেমন করে ব্যাকুলতা হয় এই কথা জিজ্ঞাসা করায় প্রথম দিন শ্রীগুরুদেব ঐ ভৃত্যের প্রতি প্রভুর ব্যবহার ঘটিত উদাহরণ দিয়েছিলেন। আর যেদিন লম্ফঝম্ফ করেছিলাম তার পরে একদিন বলেছিলেন, 'তাঁকে পেতে গেলে জ্যান্তে মরা হয়ে তাঁর নাম নিতে হবে।'

বসন্তদার মুখে একদিন শুনেছিলাম মাস্টার মশাই বলেছিলেন—'দ্যাখ্ বসন্ত, যখন চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর স্মরণ মনন চলছে জানবি, তখন ভাববি কিছু হয়েছে, তার আগে কিছু নয়।'

পূজনীয় শিবানন্দ মহারাজ একদিন বলেছিলেন, 'তিনি ভাব-অভাবের পার—শান্ত, শাশ্বত, অজ, অমর, অভয়, ইত্যাদি। আর একদিন ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন যে, 'ভগবানকে না

ধরলে ব্রহ্মচর্য হতেই পারে না। ব্রহ্মচর্য কেন করবে? কি দরকার?' (তাঁর বলবার উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে ভগবানকে পাবার জন্যই তো শাস্ত্রে ব্রহ্মচার্য পালনের কথা আছে। যদি ভগবানকে চাও ও প্রার্থনা কর তবে তো আপনা আপনিই ব্রহ্মচর্য থাকবে। আর যদি না চাও তবে আর প্রয়োজন কি!)

সর্বভূতে নারায়ণ দর্শন সম্বন্ধে একদিন (ঠাকুরের উৎসবের দিন) বলেছিলেন, 'তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, বল—"প্রভু প্রকাশ হও, আমাদের অজ্ঞানের পারে নিয়ে চল।"'

আর একদিন ভক্তি প্রার্থনা করায় বলেছিলেন—'হ্যাঁ নিশ্চয়ই হবে। অমনি আসছ নাকি!' একদিন আমায় নিজে প্রসাদ দিয়েছিলেন। কি জানি দুধ দিয়ে খাচ্ছিলেন তার পরে আমায় খেতে দিলেন। আর শ্রীগুরুদেব একদিন মহাপুরুষের প্রসাদ আমায় খাইয়েছিলেন। বলেছিলেন—'নে মহাপুরুষের প্রসাদ খা।'

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৪

ঠাকুরের জন্মতিথি পূজার দিন। বৈকাল নাগাদ মঠে গিয়েছিলাম এবং সেখানে ছিলাম। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের নিকট অনেকক্ষণ বসেছিলাম। অনেকদিন পরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তাঁর মুখে এই গানটি শুনলাম—'আমরা গোরার সাথী হয়ে ভাব বুঝতে নারলুম রে। ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব হবে বৈকি রে। গোরা আপনার পায়ে আপনি ধরে। ভাব হবে বৈকি রে। ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়। ভাব হবে বৈকি রে।'

ওঁ নমো নারায়ণায়

শ্রীপ্রভুর কৃপায় জেনেছি যে একজনকে গুরুরূপে উপাসনা পতিব্রতা নারীর আচরণের ন্যায় পবিত্র এবং শ্রেয়োবিধায়ক। কিন্তু মনে মনেও বহুকে গুরুরূপে উপাসনা বেশ্যাবৃত্তির ন্যায় হেয় এবং নীচতার পরিচায়ক।

প্রভুর কৃপায় আজ দেখলুম টিকটিকিরা সব গ্যাসের আলোর কাছে খাবার খুঁজতে গিয়েছে। আলো দেখে পোকারা ছুটে আসে আর পোকাগুলো টিকটিকির খাবার। যে প্রাণী যে জিনিসের প্রয়োজন বোঝে সে অমনি করেই আটুপাটুভাবে তার অন্বেষণ করে। ঐটুকু টিকটিকি এতখানি লম্বা গ্যাস পোস্টটা বেয়ে উঠে খাবারের জন্য প্রতীক্ষা করছে। জয় ঠাকুর। প্রভুর অশেষ মহিমা। প্রভুর নাম জয়যুক্ত হোক। ধন্য প্রভু, ধন্য প্রভু! জয় প্রভু, জয় প্রভু! ধন্য তব মহিমা, হে নাথ! প্রভুর ভক্তের মুখে শুনলাম—'যা মন চায় তাই মন্ত্র। ভগবানের নামই মন্ত্র। যখন যা ভাল বলে বোধ হবে তখন সরলভাবে তাই করে যাবে।' ভক্তটি বললেন প্রভু বলেছেন, 'যে তাঁর কথা ভাববে সে তাঁরই হয়ে যাবে। দেখ না ভাবলে আর কি করা যাবে! লোকে কত কঠোর করছে, কত উৎসাহ করে উন্নতি করছে, হঠাৎ হয় তো মনের গতি বদলে গিয়ে কামিনী-কাঞ্চনে ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়ে গেল। কার ভাগ্যে কি ঘটবে কিছুই ঠিক বলা যায় না। তাই প্রার্থনা করা দরকার—"হে প্রভু, যদি আমিও তোমায় ভুলে যাই নাথ, তুমি যেন আমায় ভুলো না। তুমি আমার হাত ধরে নিয়ে চল।" '

তিনি আরও বললেন, 'ঠাকুরের কত দয়া শোন। একবার উৎসবের সময় একটা স্ত্রীলোক দুটি রসগোল্লা কিনে নিয়ে গিয়েছিল "আর মনে মনে ভাবছিল, আমি অধম প্রভু কি আর এগুলি খাবেন! আজ কত ভক্ত কত কি দিচ্ছেন, ভাঁড়ারে জিনিস আঁর ধরে না।" ঠাকুর কীর্তনে খুব মেতে গিয়েছিলেন হটাৎ এসে সেই স্ত্রীভক্তটির কাছ থেকে রসগোল্লা চেয়ে নিয়ে খেয়ে পুনরায় কীর্তনে যোগ দিলেন। যাঁর এত দয়া তাঁর কৃপা স্রোতে হাত পা ছেড়ে গা ভাসিয়ে দিয়ে থাকা যাক, আর কি করব!' আরও বললেন, 'যাকে তুমি ভালবাস তার খুব মঙ্গল হোক এই চিন্তা করবে। যাঁর দয়া পেয়ে ধন্য হয়েছ আর পাঁচজনে তাঁর দয়ার খবর পেয়ে ধন্য হোক, এই চেষ্টা কর। দেখ

তোমার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হবার পরে আমি কেঁদে কেঁদে ঠাকুরকে জানিয়েছিলাম যে তিনি যেন তোমার মঙ্গল করেন।' (আদীশ্বর)

'দেখ লোকে ছেলেপিলেকে ভালবাসে বলে ছেলে মরে গেলে তার ঝিনুক খানা দেখেই কত কান্না কাঁদে। কিনা এখানা তার ঝিনুক। তেমনি ঠাকুরের সন্তানদের কাউকে মনে রাখলেও তাঁরই কথা মনে করা হয়। যে কোন রকমে পার তাঁর বিষয় সর্বদা ভাববে। হঠাৎ কোন ভাবে বেশী রকম অভিভূত হয়ে পড়াটা যে হৃদয়ের নিরবচ্ছিন্ন সদ্ভাবের পরিচায়ক, তা নয়। তবে যে সময়ে হটাৎ moved হওয়া যায় সেই momentটাও (মুহূর্তটাও) blessed (ধন্য)। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর ভাব সব সময় মনে করাটাই খুব শুভ লক্ষণ। ভাল ভাবটাই যেন তোমার Normal condition of mind (মনের স্বাভাবিক অবস্থা) হয়। হরি ওঁ তৎসৎ।'

ভক্তটি বলেছিলেন—'যার তীব্র বৈরাগ্য তার পক্ষেই আগে ভগবদ্দর্শন, তারপর কাজ। মন্দিরে আগে কালীদর্শন তার পর দান কর আর না কর।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'গল্প করে যে সব সময় যায় ততক্ষণ ভগবানের নাম করলে কাজ দেয়।'

বসন্তবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ঠাকুরের নাম হল। তারপরে বিশ্বাসের কথা উঠল। আমি বললাম, 'এই আমার বিশ্বাস হল, আবার হয়ত অবিশ্বাস আসবে—যেন হাজরা মশাইর মতো আমার স্বভাব!' তিনি বললেন, 'একটা লোক ঠাকুরকে একদিন বলেছিল, "আপনিই সব, আপনিই ভগবান।" ঠাকুর তার পরের দিন একটা গাছে উঠে প্রস্রাব করতে গেছলেন, লোকটা তাই দেখে বলেছিল, "আপনি উপদেবতাগ্রস্ত।" গিরিশবাবুর যখনই অবিশ্বাস আসত তিনি বলতেন, "শ্যালা এবার গাছে উঠে প্রস্রাব করতে আরম্ভ করেছে।"'

'ত্রিগুণের অতীত হতে হলে হরিনাম করা দরকার। শঙ্কর হরিনামে সদামগ্ন, তাই তিনি ত্রিগুণাতীত। ত্রিশূল—সত্ত্বরজস্তমঃ

তিনগুণের চিহ্নস্বরূপ। গঙ্গা কিনা ত্রিগুণাতীতা ভক্তি—তাঁর মাথায় সদা বিরাজমানা রয়েছেন। সেই ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হয়ে জগৎকে শান্তি দিচ্ছে। সেই ভক্তি ত্রিগুণাতীতা, তিন গুণ ছাড়িয়ে গেলে তবে ভক্তি, যা শঙ্করের মস্তকে সদা বিরাজিতা। হরিনাম নিতে শঙ্করের মত অচল অটল সুমেরুবৎ হয়ে সদা প্রভুর ধ্যানে মগ্ন থাকতে হবে। ঠাকুর আমাদের বুড়ো শিব—হরিনামে সদা বিভোর হয়ে আছেন। হরি লীলারসময়। হরি পাপহারী।'

'গাছের ডালপালাগুলো গাছের মূল নয় কিন্তু গাছ রয়েছে বলে ডালপালাগুলো রয়েছে। আর ডালপালা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে গিয়ে যত নীচের দিকে যাবে ততই মূলের কাছাকাছি আসবে। শেষে মাটি ভেদ করে মূল পাওয়া যাবে। কিন্তু মূল না থাকলে গাছ থাকত না। জগৎ তাঁর থেকে হয়েছে কিন্তু তিনি জগতের অতীত।'

বিবিধ

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৩৫

অমূল্য মহারাজের সঙ্গে উদ্বোধনে নানা কথা (সদালাপ) হবার পর উভয়ে যখন বেড়াচ্ছিলাম তখন ট্রামে বেড়াতে বেড়াতে বলেছিলেন —(মহারাজের কাছে শুনেছিলেন) 'দেখ, ললিত, এক সময় স্বামীজী ঠাকুরকে দেখেছিলেন রাধারানীরূপে। তারপর কিছুদিন তিনি রাধা নাম জপকরতেন।'

অমূল্য মহারাজ ঠাকুরের একটা গল্প বললেন। ঠাকুর বলতেন : একটা বনে দাবানল লেগেছে, যে একটা হাতি আছে চলে যাচ্ছে। একসার পিঁপড়া তা দেখে হাতিকে বললে—'দেখ তুমি তো বেঁচে গেলে, কিন্তু আমাদের নিস্তার নেই। তুমি যদি এই ডালটা ভেঙ্গে দূরে ফেলে দাও তাহলে আমরা প্রাণে বাঁচি।' তাই শুনে হাতি তাই করলে। তারপর কিছুদিন গেল। সেই হাতিটা একদিন বনের মধ্যে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে চিৎকার করছে, এমন সময় সেই

পিঁপড়ের সার সেই দিক দিয়ে যাচ্ছিল। তারা সেই হাতির কাতর ধ্বনি শুনে ভাবতে লাগল আর পরস্পর বলাবলি করতে লাগল— 'আচ্ছা এ-ত দেখছি চেনা স্বর আমাদের।' তখন তারা গিয়ে দেখে সেই হাতিটা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তারা ভাবলে আচ্ছা এর কিছু উপকার করা যায় কিনা! তখন তারা হাতির শরীরের চারিদেকে ঘুরে ফিরে, কতকগুলি নাকের ভিতর ঢুকে দেখলে সেখানে একটা পোকা ঢুকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। তখন তারা সবাই মিলে কুরে কুরে সেই পোকাটাকে মেরে ফেললে। হাতি যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেলে। ঠাকুর তাই বলতেন, 'কারুকে ছোট ভেব না। কার দ্বারা কখন কি হয় তার কোন ঠিক নেই।' 'আপিপীলিকাৎ সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সর্ব্বংযদয়মাত্মা।'

অমূল্য মহারাজ বলেছিলেন, 'কাঙ্‌ড়ী valley-তে (উপত্যকাতে) থাকার সময় মহারাজ ও হরি মহারাজকে দেখে লোকে বলেছিল— "এঁরা এমন সাধু যে, এমনধারা দেখা যায় না! একেবারে বেদাগ।" '

অমূল্য মহারাজকে বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন হাজরা মহাশয় স্বামীজীকে একদিন বলেছিলেন, 'ওঁর কাছ থেকে কিছু আদায় করে নাও।' ঠাকুর ঘরের মধ্যে ছিলেন। তাই শুনে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে স্বামীজীকে বললেন, 'উঠে আয়, উঠে আয়। ওরে, ভিখারী যারা তারা ঘেনর ঘেনর করে। ওরে, তোরা আবার চাইবি কি! আমার যা কিছু সব যে তোদের। তোদের কি আর চাইতে হবে!'

শ্রীশ্রীঠাকুরের মঠ যখন বেলুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন স্বামীজীর মনে হয়েছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের দু' রসদ্দার—বলরামবাবু ও সুরেশবাবু—যদি তখন জীবিত থাকতেন তবে তাঁরা কতই না আনন্দ করতেন। তিনি একথাও বলেছিলেন, 'এই মঠ দেখলে তাঁরা আনন্দে নৃত্য করতেন।' কিন্তু স্বামীজী পরে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ তাঁরা এসেছিলেন।'

বেদ ও আচার্য স্বামী প্রেমানন্দ

(জন্মতিথিবাসরে ভক্তসম্মেলনে বেলুড় মঠে পঠিত)

বিদ্যা যস্য পরা শক্তিরবিদ্যা হ্যপরাপি চ।
স্বামিহোপহ্বয়ে দেবং রামকৃষ্ণং সপার্ষদম্॥"

সভাপতি মহাশয় ও সভ্যবৃন্দ, শ্রীভগবানের মূর্তিজ্ঞানে আপনাদের চরণে আন্তরিক ভক্তিভরে আমি প্রণত হইতেছি। আজ এই ভক্ত পরিষদে যে অমৃত পরিবেশনের ভার মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির হস্তে সমর্পিত হইয়াছে সেই অমৃত বিতরণে কতদূর সমর্থ হইব জানি না; তবে যাঁহার জীবন অমৃতময় ছিল, আনন্দ হইতে যিনি আসিয়াছিলেন, আনন্দে যিনি বিরাজমান ছিলেন, আনন্দে যিনি লীন হইয়াছেন, সেই আনন্দময় পুরুষের চরণ স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করি, তিনি স্বয়ং তাঁর দাসের হৃদয়স্থ হইয়া সেই অমৃত পরিবেশনে সহায়তা করুন। যিনি বেদপ্রতিপাদ্য আনন্দময় ব্রহ্মকে লাভ করিয়া বিশালতা লাভ করিয়াছিলেন, যিনি প্রেমে বিরাট পুরুষের উপাসনা করিয়া বৈরাজপদ লাভ করিয়াছিলেন, প্রথমে বেদের সেই পরম-পুরুষের মহিমাব্যঞ্জক, সেই বিরাট পুরুষের মহাভাব প্রকাশক বেদের পুরুষসূক্তের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া, তাঁহার জীবনের সঙ্গে স্তরে স্তরে মিলাইয়া তাঁহার জীবন্ত জীবনবেদের আলোচনায় অগ্রসর হইব। বেদের তত্ত্বগুলি যেখানে জীবনের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে সেইখানেই বেদের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাইব। তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, তাই 'বেদ ও আচার্য স্বামী প্রেমানন্দ' এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

পুরুষসূক্তটি ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০তম সূক্ত। সূক্ত বলিতে কতকগুলি মন্ত্রসমষ্টি বুঝায়। এই সূক্তে ১৬টি ঋক্ অর্থাৎ পদ্যময় মন্ত্র আছে। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় বিরাট পুরুষের উপাসনা। বিরাট

বলিতে ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝায়। বিবিধ বস্তু যাহাতে প্রকাশ পায় তাহাই বিরাট। এই বিরাট দেহে যিনি অভিমানী তিনি বিরাট পুরুষ। পুরুষ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নানাবিধ, তন্মধ্যে একটি হইল 'পুরি শেতে', পুরে অর্থাৎ দেহে যিনি বাস করেন তিনি অর্থাৎ দেহীই পুরুষ। আমরা যেমন ক্ষুদ্র একটি দেহে নিজদিগকে নিবদ্ধ রাখিয়া সেই দেহ অবলম্বনে সকল ব্যবহার চালাইয়া থাকি, সেই দেহের সুখ দুঃখ লাভ অলাভ লইয়া ব্যস্ত, সেইরূপ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড দেহটিকে আশ্রয় করিয়া তদ্দেহে যিনি আত্মীয়ত্ব বুদ্ধি করিয়া সেই ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সকল জীবের সুখ দুঃখ লইয়া সকল ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তিনিই বিরাট পুরুষ। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডটিকে সৃষ্টি করিবার কালে তিনি নিজেকে বলি দিয়াছিলেন, সেই ত্যাগের ফলে বিশ্বের উৎপত্তি ইত্যাদি কথাই এই সূক্তে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এটি ব্রহ্মের সগুণ ভাব। ব্রহ্ম যখন সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম কহে। কিন্তু এই সৃষ্টি প্রভৃতির কর্তৃত্ব ব্যতীত তাঁহার আর একটা দিক্ আছে যাহা গুণাতীত, যাহাকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে গিয়া শ্রুতি সকল জিনিসের উল্লেখ করিয়া 'নেতি নেতি' রবে সদর্পে বাদ দিয়াছেন—'ইহা নহে, ইহা নহে,' বলা ছাড়া আর কোন সরল পন্থা পান নাই। সেই বেদের প্রতিপাদ্য যাহা নির্গুণ ব্রহ্ম বস্তু—তাহাও প্রতিপাদনের ইচ্ছায় কৃপাসাগরী ভগবতী শ্রুতিদেবী এই সূক্তের অবতারণা করিয়াছেন। প্রথমে জীবকে সগুণভাবের গাম্ভীর্য উপলব্ধি করাইবার জন্য বিরাট পুরুষের বিশালতা প্রকাশক 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ'—পরমপুরুষকে সহস্রশীর্ষযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়া 'স ভূমিং সর্বতো বৃত্বা'—তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া বর্ণিত হইল। তারপর শ্রুতি একটু সুর বদলাইয়া বলিলেন, হে জীব! ঐখানেই সন্তুষ্ট থাকিও না। তিনি কেবল এই বিশ্বে পর্যবসিত নহেন, ইহার বাহিরেও তিনি বিরাজমান। তিনি দশাঙ্গুলির বাহিরে, গণনার বাহিরে, জানাজানির বাহিরে, ইহাই ফুটাইবার জন্য শ্রুতি

আকুল। কখন সাক্ষাৎ তারস্বরে বলিতেছেন, 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ', কখন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতেছেন 'এতাবান্ অস্য মহিমা' জগতে যাঁহার অতুল কীর্তি, অতুল ঐশ্বর্য, তিনি তাঁহার অপেক্ষা অনেক বড় (অতোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ)। কত বড় তাহা ভাষায় বুঝান কঠিন। তবে ইঙ্গিতে আভাষে তাহার পরিচয় দিয়া শ্রুতি স্বয়ং বলিলেন—'পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি'—বিশ্বভূতাত্মক এই সমস্ত জগৎ তাঁহার পাদমাত্র অর্থাৎ চতুর্থাংশ। আর 'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' অর্থাৎ তিনপাদ—বার আনা অংশ অমৃতময়, স্বীয় স্বপ্রকাশ স্বরূপে অবস্থিত। তাহাকে টানিয়া আর ব্যক্ত দশায় আনয়ন করা গেল না। 'ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ'—ত্রিপাদ পুরুষ উর্ধ্বে বিরাজমান। সংসারের অনেক উর্ধ্বে যেখানে সংসারের দোষগুণ পৌঁছায় না। চেতন অচেতন জীবনিবহের সৃষ্টির জন্য তাঁহার অতি সামান্য অংশমাত্র জগদ্রূপে প্রকাশিত হইল। তিনি স্বয়ং তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাণ্ড-শরীরী হইলেন। 'বিরাজো অধি পূরুষঃ'—অমৃতত্বের যিনি নিয়ন্তা তিনি জীবের ভোগের জন্য নিজের দিকে বিন্দুমাত্র না তাকাইয়া জীবসাজে সজ্জিত হইলেন। অহো দুর্দৈব! হে জীব, ইহা দেখিয়া তাঁহার অভিমুখী হও, শ্রুতি ইহা বলিবার অভিপ্রায়ে ইঙ্গিতে বলিলেন 'উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি।'—তাঁহার ঐশ্বর্য দেখান শ্রুতির অভিপ্রায় নয়। তাঁহার ত্যাগ দেখানোই অভিপ্রায়। পরমপ্রভু জগন্নিয়ন্তা। তিনি তো স্বীয় স্বরূপে অনায়াসে পরিতৃপ্ত থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিলেন কৈ? 'স একাকী ন রমতে' (বৃ. উ. ১।৪।৩)—তিনি একা স্বীয় রসাস্বাদনে সুখী হইলেন না, তাই জীবকে পরিতৃপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার এত চেষ্টা। জীব যে তাঁহার স্বরূপভূত হইয়াও কিছুতেই তাহা বুঝে না, এই তাঁর বড় দুঃখ, তাই জীবকে তাহার স্বরূপ বুঝাইবার জন্য শ্রুতিদেবীকে সঙ্গে আনিলেন। ভগবতী শ্রুতি জননীর ন্যায় হিতৈষিণী। তিনি তারস্বরে আহ্বান করিয়া তাঁহার সন্তানগণকে সুপথে পরিচালিত করিতে সদা উন্মুখিনী।

এই সূক্তে তাই দেখিতে পাই শ্রুতি বলিলেন—'যিনি বিরাটের ত্যাগ বুঝিতে সমর্থ হইবেন, তিনি বৈরাজ-লোক প্রাপ্ত হইবেন।' 'তে হ নাকং মহিমানঃ সচংত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ' অর্থাৎ পূর্বেকার সাধ্য দেবগণ ও ঋষিগণ যাঁহার (বিরাটের) তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন তাঁহারা যেরূপ বৈরাজ-লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অধুনাতন যে কেহ সেইরূপ বিরাট পুরুষের মহিমা উপলব্ধি করিবেন তিনিও বিরাটের সহিত মিলিত হইবেন। বেদ পরমেশ্বরের বাণী—'বাগ্‌বিবৃতাশ্চ বেদাঃ' (মু. উ. ২। ১। ৪) তাহাও অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হইল। মানুষের জীবনের ভিতর দিয়া এই বচন বিকশিত হইল। আমরা নিজ চক্ষুর সম্মুখে এইরূপ বিরাটভাবপ্রাপ্ত দেবমানবকে দেখিতে পাইলাম। অদ্যকার সভায় যাঁহার জীবন আলোচ্য, ঈশ্বরীয় প্রেমে তিনি যে বিরাটের উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহা আমার বলিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইতে হইবে না, যাঁহারা তাঁহার পবিত্র সংসর্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এ কথায় একমত হইবেন—আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি প্রত্যেক জীবের, বিশেষতঃ ভক্তগণের মধ্যে শ্রীভগবানের বিকাশ দেখিতে পাইতেন, তাহা ভক্তগণের প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেমপ্রসূত ব্যবহারে বেশ অনুমিত হয়। কি প্রকারে ভক্তগণ শ্রীভগবানের দিকে উন্মুখ হইবে তাঁহার সকল প্রচেষ্টা সেই দিকে ছিল। ভক্তগণের শারীরিক সুবিধাগুলি উপেক্ষিত হইলে তাহারা ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে পরাঙ্মুখ হয়, এই জন্য সর্বাগ্রে তিনি তাহাদের শারীরিক অভাব অভিযোগ দূরীকরণে সচেষ্ট হইতেন। তাঁহার সময়ে মঠে যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা জানিতেন তিনি সকলের প্রসাদ ধারণের দিকে কিরূপ দৃষ্টি রাখিতেন। এমনও দেখা যাইত, যে সকল ভক্ত মঠে রাত্রিযাপন করিতেন তাঁহাদের জন্য বিশেষ দুগ্ধাদিরও ব্যবস্থা করিতেন। রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত না হয়, তজ্জন্য বিশেষ শয্যাদিরও ব্যবস্থা করিতেন, যাহা হয়ত মঠবাসী সাধুগণের সকলে অনুমোদন করিতেন না।

প্রত্যুত এই কার্যগুলি তাঁহার খেয়ালপ্রসূত মনে করিয়া আমরা অনেক সময় হয়ত তাঁহার সহিত অশিষ্টতার পরিচয়ও দিয়াছি। মহতের আচরণ সর্বতোভাবে সাধারণের বিষয়ীভূত হয় না—উহা হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায়। সকল মহাপুরুষের জীবনে এইরূপ সব ঘটনা দেখা যায় যে যাঁহারা তাঁহাদের সহিত খুব নিগূঢ়ভাবে মিশিয়াছেন তাঁহারাও সকল সময়ে তাঁহাদের ব্যবহারে তাঁহাদের হৃদ্‌গত ভাব ধারণা করিতে পারেন নাই ; বরং সময়ে সময়ে বিপরীত ধারণাও করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের শিষ্যবর্গ কেহ কেহ তাঁহার আচরণ না বুঝিয়া শ্রীবুদ্ধের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পলায়নও করিয়াছিলেন দেখা যায়। ভক্তের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ চিন্তা করা যে তাঁহার অন্তরের জিনিস ছিল, সেই চিন্তায় যে তাঁহাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইত একথা যাঁহারা একটু শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার ব্যবহার লক্ষ্য করিতেন তাঁহারা সকলেই বিদিত আছেন। ভক্ত সমাগমে তিনি যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। যে দিন মঠে ভক্তগণ কম আসিত বা আসিত না, সেদিন যেন তাঁহার তৃপ্তি হইত না। ঐরূপ অবস্থায় কখন কখন দেখা গিয়াছে তিনি গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া তারস্বরে আহ্বান করিয়া বলিতেন—'ভকত্‌ আযাও, ভকত্‌ আযাও।' তখনকার দিনে দেশ বিদেশ হইতে বেশী লোক নৌকা করিয়া কলিকাতার আহিরীটোলা প্রভৃতি ঘাট হইতে মঠে আসিতেন। তাই তিনি গঙ্গার দিকে তাকাইয়া সাদরে ভক্তগণকে ডাকিতেন। এমন ঘটনাও দেখিয়াছি যে, ঐরূপ আহ্বানের স্বল্প পরেই হয়ত এক নৌকা লোক মঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তখন নিজেদের বুদ্ধির মাপকাটিতে মাপিয়া উহা কাকতালীয়বৎ ঘটিয়াছে মনে করিতাম। একদিনের কথা মনে পড়ে। দ্বিপ্রহরে এক নৌকা অপরিচিত ভদ্রলোক আসিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের আহারাদি হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাঁহারা ৺দক্ষিণেশ্বর ঘুরিয়া আসায় তখনও আহারাদি হয় নাই। অথচ

এদিকে মঠের খাওয়া দাওয়া সব শেষ হইয়া গিয়াছে। পাচক প্রভাকর ঠাকুরও নাই, ভাণ্ডারী গোপাল মহারাজ বিশ্রাম করিতেছেন, তিনি তখন নিজে পাকশালায় যাইয়া কোনরকমে নির্বাণোন্মুখ চুল্লীতে ইন্ধন যোগাইয়া খিচুড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে গেলেন। যতদূর স্মরণ হইতেছে, তখন ভাণ্ডারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রান্নার সব ব্যবস্থা হইয়া গেল। বেলা ২/৩ টার সময় ভক্তগণ প্রসাদ পাইলেন। প্রসাদ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তাহাদের সহিত আলাপাদি করিতে লাগিলেন। মানুষে—মানুষবুদ্ধি করিলে—তিনি হয়ত ঐরূপ করিতেন কিনা সন্দেহ। এ সম্বন্ধে তাঁহার মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি তাহা আপনাদের অবগতির জন্য এখানে উল্লেখ করিতেছি।—তিনি বলিতেন, 'ওগো, কি দেখি যেন—সব প্রভুর জন্য এখানে আসে। এখানে এই আসা বড় ভাগ্যের কথা। তিনি টানলে তবে আসতে পারে, নতুবা কার সাধ্য!' এসব কথা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন; যুক্তিজালে ফেলিলে আপাত ক্ষুদ্র বিসর্পিদৃষ্টিতে বিপরীত ধারণাই সমুপস্থিত হয়, মনে হয় তবে সময়ে সময়ে দুষ্ট লোকের আমদানি কিরূপে হয়? বিশেষতঃ উৎসবাদিতে তো নানাজাতীয় লোকের সমাবেশ হয়। যে জিনিস বুঝি না তদ্‌বিষয়ে প্রয়াস বিফল। জগতের সব জিনিস বুঝি বা বুঝিবার সামর্থ্য রাখি—একথা তো বুক ঠুকিয়া কেহ বলিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে নচিকেতার প্রতি যমের উক্তিটি বেশ মনে পড়ে—'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া' (ক. উ. ১। ২। ৯) যুক্তির দ্বারা এই শ্রদ্ধা অতিক্রম করা উচিত নয়। তাই আমি কেবল যুক্তির অবতারণা করিয়া এই ক্ষুদ্র শ্রদ্ধাটুকুকে অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক নই। আমি শ্রদ্ধার আশ্রয়ে তাঁহার জীবনের দুই-চারিটি ঘটনা বুঝিবার চেষ্টা করিব। পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ-স্বামীর শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম—'ওরে, শ্রদ্ধা কোরে ওঁরা যা বলেন তার দু-একটি যদি পালন করতে পারিস তো জীবন ধন্য হয়ে যাবে দেখবি। ওঁরা কি সামান্য মানুষ রে, যেদিকে তাকান সেই

দিকটা পর্যন্ত পবিত্র হয়ে যায়।' শ্রীভগবানের পার্ষদগণ নিজেরা যেমন নিজেদের বুঝিতেন তেমন কেহই আর তাহাদিগকে বুঝিতে সমর্থ নন।

এ বিষয়ে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ তাঁহার গুরুভাইদের কি চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহাদের প্রতি তাঁহার কিরূপ সশ্রদ্ধ ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছি তাহাই এখানে আপনাদের নিকট বলিতে চাই। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঠাকুরঘর হইতে আসিয়া, পূজনীয় মহারাজজী যখন মঠে থাকিতেন তখন, বরাবর তাঁহার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং করযোড়ে 'দণ্ডবৎ মহারাজ, দণ্ডবৎ' বলিয়া তাঁহাকে প্রণতি বিজ্ঞাপন করিতেন। মহারাজ হয়ত ধ্যানের পর নিজ শয্যায় আসীন আছেন, আমরা তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া আছি। তিনি প্রত্যুত্তরে একটু মৃদু হাস্যে বলিতেন—'এস বাবুরামদা, এস।'—ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই দুই-একটি মিষ্ট সম্ভাষণের মধ্যে কি যে অমৃতময় প্রেমপ্রবাহ বহিয়া যাইত তাহা বুঝাইবার সামর্থ্য আমার নাই। ইহার পর মহারাজের অনুমতি লইয়া বাবুরাম মহারাজ নামিয়া আসিয়া মঠের কাজকর্মে মন দিতেন। যেদিন বেলা অধিক হইয়া যাইত সেদিন তিনি মহারাজকে গিয়া বলিতেন—'মহারাজ, তুমি হুকুম কর, এরা কাজকর্মে একটু যাক।' এইরূপে আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া নামিয়া যাইতেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবনধারা একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত যে প্রতিদিন প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগাদির আয়োজনে তিনি প্রথমে মন দিতেন। তাই প্রাতেই একবার বাগানের দিকে গিয়া গাছপালা ফুলফল সব দেখিয়া আসিয়া সেদিন কি রন্ধন হইবে তাহার ব্যবস্থা করিতেন। অনেক সময় তিনি নিজে কুটনো কোটার সময় উপস্থিত থাকিয়া আমাদের লইয়া কুটনো কুটিতেন। কখন বা কার্যান্তরের জন্য গঙ্গার দিকে অথবা ভিতরের বারন্দায় মৌনভাবে অবস্থান করিতেন। তখন, যিনি প্রভুর ভাণ্ডার দিতেন তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—'আজ কি রান্না হবে?' ভাণ্ডারীর

পক্ষে এই ব্যাপারটি একটু গুরুতর কাজ ছিল, কারণ অনেক সময় প্রশ্নের জবাব না দিতে পারিলে তিরস্কৃত হইতে হইত। তাহার কারণ খুঁজিলে দেখা যাইত—তিনি ভাণ্ডারে বা বাগানে কি আছে না আছে তাহার সঠিক উত্তর দিতে পারিতেন না। বাবুরাম মহারাজ আমাদের শিক্ষা দিতেন—'ওরে, তোদের practical (কর্মদক্ষ) হতে হবে। ঠাকুরের সব জিনিসপত্রের ওপর আত্মীয়তা বোধ করতে হবে। ঠাকুরের কোন জিনিসের অপচয় যেন না হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে।'

এখন মনে হয় বাবুরাম মহারাজ চাইতেন—তিনি যেমন সকল বিষয়ে ঠাকুরের ছিলেন, ঠাকুরের কাজে অবহিত থাকিতেন, আমরাও তদ্রূপ হই। কিন্তু আমাদের সে সামর্থ্য ছিল না, তাই তিনি ক্ষুণ্ণ হইতেন। তবে ইহাও ঠিক যে, তিনি যেমন আমাদিগকে তিরস্কার করিতেন, সেইরূপ স্নেহও করিতেন। তখনকার দিনের সকলে এ বিষয়ে একমত যে তিনি আমাদিগকে অসীম স্নেহ করিতেন। দুই-একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে আপনারাও ইহা বুঝিতে পারিবেন। প্রায়ই দেখা যাইত যেদিন যাহাকে তিনি তিরস্কার করিতেন, আহারের সময় সেদিনকার উত্তম জিনিসটি তাহাকেই অধিক দিতেন। স্বামী বেদানন্দের (প্রভাস মহারাজ) নিকট শুনিয়াছি—একদিন তাঁহাকে ঐরূপ তিরস্কার করার পরে তিনি ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অভিমানে বসিয়া আছেন, পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ একটি বাটিতে করিয়া দুধমাখা প্রসাদী অন্ন লইয়া আসিয়া দ্বারে আঘাত করিতেছেন, 'ওরে দোর খোল, দোর খোল।' আর প্রভাস মহারাজ আরও আরও অভিমানে বলিতেছেন, 'না আমি দোর খুলব না, খুলব না।' পরিশেষে তাঁহার কাতর আহ্বানে যেমনিই তিনি রুদ্ধদ্বার অর্গলমুক্ত করিলেন অমনিই দেখিতে পাইলেন সেই প্রশান্ত মূর্তি, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় বাটি হইতে অন্ন লইয়া 'খা বাবা, খা, রাগ করিস নে' বলিয়া তাঁহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিলেন। এই সকল ঘটনা মনে

হইলে মনে হয়—আমরা তাঁহার হৃদয়ের মাধুর্য-সকল বুঝিতাম না; সেই কারণে তাঁহাকে কত কষ্টই না দিয়াছি। আমরা যে প্রেমময় মূর্তি সম্মুখে পাইয়াছিলাম তাহা জগতে দুর্লভ, আর তো সেরকম খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমাদের মতো বেগুনওয়ালার দোকানে হীরার দাম বড় জোর নয় সের বেগুন।

বাবুরাম মহারাজ প্রত্যহ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাণ্ডারের সব সন্ধান লইতেন এবং তাহার পর আশ্রমের অন্য কর্ম পরিদর্শন করিতেন। তার মধ্যে তিনি যখন স্বয়ং পূজা করিতেন—তখনকার কথা আরও হৃদয়স্পর্শী। তৎকালে তিনি কুটনো কুটিবার পর—স্নানের জন্য একটু তেল মস্তকে দিয়া অতি দ্রুত গতিতে গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিতেন। তৎপরে তাঁহার পরিধানের কাপড়খানি পরিধান করিয়া—কমণ্ডলুটি ভরিয়া জল লইয়া দ্রুত পদে ঠাকুরঘরে যাইতেন। ইতিমধ্যে পূজার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া সজ্জিত থাকিত। তিনি পূজার সময় সামান্য একটু মন্ত্রদ্বারা সামান্যার্ঘ্যাদি স্থাপন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নান সমাপন করিতেন এবং জলখাবার প্রদান করিতেন। বেদী পুষ্পাদিতে সজ্জিত করিতেন। ঠাকুরের পদরজপূর্ণ কৌটাটি পূজা করিয়া শিবপূজাতে পূজা শেষ করিতেন।

ইতিমধ্যে ঠাকুরের শ্রীপাদুকার উপর পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া, পূজনীয় স্বামীজী মহারাজের ও পূজনীয় যোগানন্দ স্বামীজীর পূজা করিয়া পাত্রাবশিষ্ট পুষ্প লইয়া গঙ্গাপূজার জন্য বাহির হইতেন। আমি তাঁহার পূজার সময় কখন কখন লক্ষ্য করিয়াছি তিনি পূজা কালে মধ্যে মধ্যে উঠিয়া শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বিলুণ্ঠিতকায়ে আত্মনিবেদন করিতেন। এই উপাসনার মাধুর্যময় ফল অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্রীমুখে ফুটিয়া উঠিত। তাই তিনি যখন পুষ্পপাত্রটি লইয়া গঙ্গামায়ীর পূজার জন্য উপর হইতে নামিয়া আসিতেন, তাঁহার তখনকার সেই মুখশ্রী কি অপূর্বভাব ধারণ করিত তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনি জানেন, বর্ণনার

দ্বারা বুঝাইতে আমি অক্ষম। পরে গঙ্গাপূজা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে ভাণ্ডারী তাঁহাকে কিছু প্রসাদ দিতেন। তিনি সময়ে সময়ে উহা ভাণ্ডারের দ্বারে বসিয়া কিঞ্চিৎ স্বয়ং গ্রহন করিতেন, অবশিষ্ট সম্মুখে কেহ থাকিলে তাহাকে দিতেন। আহারাদি ব্যাপারে তিনি অতি সাধারণভাবে আমাদের সঙ্গে সমানভাবে চলিতেন। পরিধানে তাঁহার মাত্র দু'খানি কাপড়, দু'খানি মুড়ি শেলাই চাদর, আর ইদানীং হাতকাটা জামা ও পায়ে চটিজুতা দেখিতাম। একটি ছাতা ও একটি লম্বা লাঠিও তিনি ব্যবহার করিতেন। আহারের পর মুখশুদ্ধি করিরার একটি বেটুয়া ছিল। বাহিরে যাইবার জন্য একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগে একখানি গীতা দুই একখানি কাপড় ও সামান্য প্রয়োজনীয় জিনিস ভরিয়া রাখিতেন। তাঁর ব্যক্তিগত বিছানাপত্র কিছু ছিল না। একবার তিনি কোথায় বিদেশে যাইবেন, একজন আমায় আসিয়া বলিল —'তোর কি ভাল কম্বল আছে? বাবুরাম মহারাজের জন্য দিবি? তাঁর তো কিছুই নেই।' তারপর জানিলাম মঠে যে শয্যায় তিনি শুইতেন সে সব মঠের ছিল।

পূজাদি সমাপনান্তে তিনি মঠের অন্যান্য কাজের মধ্যে ভক্তগণের পত্রের উত্তর দান করিতেন। মঠের এইসব কাজ তিনি প্রভুর সেবা জানিয়া সর্বদা হাসিমুখে করিতেন। তাঁর কাছে কোন কাজ ছোট ছিল না। গোশালায় গোসেবা ব্যাপারটি তাঁহার অন্যতম কার্য ছিল। প্রত্যহ গাভীগুলির নিকট যাইয়া স্বহস্তে গাছের পালা ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতেন। ছাতা ও লাঠি সঙ্গে থাকিত। যষ্টি দ্বারা তাহাদের গাত্র কণ্ডূয়ন করিয়া দিতেন। গাভীগুলি তখন আনন্দে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। নাগরী গাইটা তো তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া উল্লম্ফন করিতে করিতে ধাবিত হইয়া তাঁহার সমীপে আসিত। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! বুঝি বা ব্রজরাজনন্দন ব্রজে এইভাবে গোচারণ করিয়া লীলা করিতেন। প্রত্যহ বৈকালে তিনি আমাদিগকে লইয়া বাগানের বৃক্ষলতাগুলিতে জল সেচনের ব্যবস্থা

করিতেন। স্বয়ং গাছে জল দিতেন এবং গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিতেন। তৎসঙ্গে আমাদিগকে নানা উপদেশ প্রদান করিতেন। একদিন বাগানে, কাজ করিতেছি এমন সময় তিনি আমাকে বলিলেন, 'practical (কর্মপটু) হও, practical হও; কেবল শ্লোক ঝেড়ে খাবি!' তিনি আমাদের সঙ্গে জাব দিতেন, শীতের দিনে গুঁড়া কয়লা মাখিয়া গুল পাকাইতেন। বর্ষার পরে বাগানের মাঠে যখন চোরকাঁটা হইত তখন তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রভুর বাগান পরিষ্কার করিতে বসিতেন। তখন মনে হইত—আমাদিগকে তিনি কেবল খাটাইতে চান। কারণ বুঝিতাম না, বুদ্ধির মালিন্যবশতঃ। পরে যখন শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠের সৌভাগ্য হইয়াছিল তখন দেখিলাম একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন, 'হে উদ্ধব, ভক্তি-যোগসাধনের প্রকৃষ্ট উপায় শুন—"উদ্যানোপবনাক্রীড়পুর-মন্দির-কর্মণি, সম্মার্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্তনৈঃ, গৃহ শুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্‌যদমায়য়া" (১১/১১/৩৮-৩৯)।' দেবমন্দির সম্মার্জন, মন্দির প্রাঙ্গণ গোময়াদি লেপনদ্বারা পরিষ্কার করা, উদ্যানাদিতে জলসেক এবং পুষ্পবাটিকা বিরচন ইত্যাদি কর্ম সর্বান্তঃকরণে ফলকামনা ত্যাগ করিয়া যিনি আমার উদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন, তাঁহার সেই সকল কর্ম আমাকে নিবেদিত হওয়ায় অনন্ত সুখের হেতু হয়। ইহা ভাগবদ্ধর্ম। উক্তস্থলে আরও উক্ত হইয়াছে, জানিয়া হউক কি না জানিয়া হউক, যিনি এইরূপে শ্রীহরির সেবাপরায়ণ হইবেন, তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ। 'জ্ঞাত্বাঽজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ। ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ' (১১/১১/৩৩)। সুতরাং দেখা গেল শ্রীভগবদ্‌গতপ্রাণ আচার্য স্বামী প্রেমানন্দ আমাদিগের পরমকল্যাণচিকীর্ষায়—আমাদের অজ্ঞাতসারে এইরূপে আমাদিগকে পরন শ্রেয়োমার্গে প্রবৃত্ত করাইয়া আচার্য-যোগ্য কর্ম করিতেন। গুরু শিষ্যের মঙ্গলের জন্য সর্বদা কর্ম করেন; কেবল যুক্তি দ্বারা শিষ্যকে বুঝান প্রাচীন রীতি নহে এবং শিশু শিষ্যের পক্ষে তাঁহা

ধারণা করাও অসম্ভব। মহাভারতে দেখা যায় আরুণি গুরুর আদেশে জল রক্ষার জন্য আলের উপর নিজ দেহ রাখিয়াছিলেন। উপনিষদে সত্যকাম জাবাল গুরুর আদেশে গোচারণে নিযুক্ত। তাঁহাদের সঙ্গে শাস্ত্র ছিল না ; গুরুকৃপায় ব্রহ্ম প্রতিভাত হইত। প্রত্যাবৃত্ত শিষ্যকে ঋষি বলিয়া উঠিলেন, 'ব্রহ্মবিদিব বৈ সোম্য ভাসি' (ছাঃ উঃ ৪।৯।২) সৌম্য, তোমার মুখে তত্ত্বজ্ঞের শ্রী উদ্‌ভাসিত দেখিতেছি। গুরুর বা আচার্যের অনুগত হইয়া চলিলে সাধকের কল্যাণ হয়, ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তখন তো সে কথা বুঝিতাম না, পরন্তু পরস্পরে বলাবলি করিতাম—'এঁরা কুলির মতো খাটাইতেছেন, এতে কি হইবে, এতে তো মানুষ গড়া হইবে না। স্বামীজীর কত ইচ্ছা ছিল এই আশ্রম জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে, বিদ্যাচর্চার একটি বিশাল কেন্দ্র হইবে, কত cultured (সুশিক্ষিত) লোক জন্মাইবে ; কিন্তু ইঁহারা যে শিক্ষাপ্রণালী দিতেছেন তাহাতে তো দেখিতেছি ইহা অচিরে একটি বাবাজীদের আখড়ায় পরিণত হইবে।' কিন্তু আপনারা মনে রাখিবেন এই বেলুড়মঠে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার মূলেও স্বামী প্রেমানন্দ। আমরা কয়েকটি যুবক যখন একসঙ্গে মঠে স্থান পাইলাম, আমাদের সংস্কৃত চর্চার জন্য তিনিই অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া এখানে প্রথম সংস্কৃত চর্চার স্থান করিলেন। সংস্কৃত শিক্ষা প্রচলন করা পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজের অন্যতম আকাঙ্ক্ষিত কার্য ছিল। তিনি শেষ জীবনে মঠে একটি বেদ বিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় দুর্জ্ঞেয় ; অকালেই তাঁহার স্থূল শরীর আমাদের চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেল। অবশ্য স্বামীজীর সংকল্প অমোঘ, একদিন না একদিন উহা মূর্তিমান হইয়া প্রকাশিত হইবে।

গুরু-ভ্রাতৃগণের প্রতি বাবুরাম মহারাজের অগাধ শ্রদ্ধা ও সপ্রেম ব্যবহারের সামান্য একটু আভাস ইতিপূর্বে শ্রীশ্রীমহারাজের সহিত তাঁহার আচরণে প্রদান করিয়াছি। অতঃপর আরও দুই-একটি ঘটনার উল্লেখে তাহা অধিকতর পরিস্ফুট হইবে। একদা শিবরাত্রি

উপলক্ষ্যে ভাঁড়ারের সম্মুখে যেখানে পূর্বে আহারাদির ব্যবস্থা ছিল তথায় শিবপূজা হইতেছে। সন্ধ্যায় প্রথম প্রহরের পূজার সময় মঠের অনেক সাধু ব্রহ্মচারী ও কয়েকজন ভক্ত উপস্থিত আছেন। এ ছাড়া তথায় মহাপুরুষ মহারাজ, হরি মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ উপস্থিত। প্রথম প্রহরের পূজার অন্তে মহাপুরুষ মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ উঠিয়া আসিলেন। আমি তাঁহাদের পশ্চাতে আসিতে লাগিলাম। দেখি তখন যেখানে বারান্দায় খাওয়া হইত সেখানে আসিয়াই বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজের দিকে করজোড়ে বলিতেছেন—'এই যে আমাদের শিব, এই তারকদা আমাদের শিব।' সে দৃশ্যটি আমার নিকট বড় মনোরম লাগিল। গুরুভাইয়ের উপর কি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা তাহা দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইয়া গেল। উদ্ধবকে শ্রীভগবান ঠিকই বলিয়াছেন, আমার উত্তম ভক্ত সেই, যিনি 'অমানী মানদঃ' (ভাঃ. ১১/১১/৩১) অর্থাৎ যিনি স্বয়ং মান প্রার্থনা না করিয়া অপরকে মান দেন।

তিনি যখন একবার মালদহ অঞ্চলে প্রচারে যান, সে সময় শরৎ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শিয়ালদহের গাড়ি ধরেন।

বিদায় লওয়ার কালে বাবুরাম মহারাজ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, 'ভাই, আমি মুখ্যসুখ্য লোক, তোমরা আশীর্বাদ কর।' অবশ্য শরৎ মহারাজও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ভাই, তোমরা মূর্খ তো পণ্ডিত কারা? ঠাকুরের কৃপায় তোমরা যা বলবে, লোকে আগ্রহ করে গ্রহণ করবে।' তিনি যখন ঢাকায় প্রচারে যান তখন হরি-মহারাজকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'মহারাজ, আপনি একবার অনুগ্রহ করে আসুন; আপনারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, আমি মূর্খোত্তম আমার দ্বারা কি হবে।' উত্তরে হরি মহারাজ লিখিয়াছিলেন, 'আপনি আমাদের কি বলিবেন! আমরা কি জানি না, ঠাকুর আপনাকে কি বলিতেন? "স্বর্ণ পেটিকা, রত্ন রাখিবার স্থান।"' শেষে

লিখিয়াছিলেন,—'কিশোরীর প্রেম বিলোচ্ছে।'

আরও একটি অপূর্ব ঘটনার স্মরণ হইতেছে। তাহা নারায়ণগঞ্জে দেওভোগে—পূজ্যপাদ প্রাতঃস্মরণীয় নাগমহাশয়ের বাটীতে। সেদৃশ্য জীবনে ভুলিতে পারিব না। পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে তিনি নাগ মহাশয়ের বাটীতে গেছেন। সঙ্গে আমরা অনেকেই আছি। নাগ মহাশয়ের পর্ণকুটীরের সম্মুখীন হইয়া তিনি তাঁহার গাত্র-বসন ও যে সামান্য একটা হাতকাটা জামা ছিল তাহা উন্মোচন করিয়া সেই পুণ্যভূমিতে সাষ্টাঙ্গ হইয়া ৫ মিনিটের অধিককাল বিলুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিলেন, 'আহা, নাগমহাশয় এখানে থাকতেন।' প্রসঙ্গক্রমে সেদিন শ্রীশ্রীমহারাজেরও অপূর্ব ভাবের কথা স্মরণ হইতেছে। তিনি নাগমহাশয়ের বাটীর এক পার্শ্বস্থিত একটি পুষ্করিণীর তীরে উপবেশন করিয়া মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন—'আহা কি চৈতন্যময় স্থান! কি চৈতন্যময় স্থান! মহাপুরুষ বাস করতেন কিনা, তাই চৈতন্যময়, চৈতন্যময়।' তারপর মহারাজের সহিত বাবুরাম মহারাজের দেখা হইবার পর উভয়ে ভগবৎ ভাবে উন্মত্ত হইয়া, কি অদ্ভুত নৃত্য করিয়াছিলেন! সেই নৃত্যকালে, 'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ,' বলিয়া উদ্দাম সঙ্গীতের রোল উত্থিত হইয়াছিল। যাঁহারা সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই অপূর্ব হরিনামের মহিমা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন। গঙ্গা স্রোতের মতো সেখানে সে ভাবধারা খেলিয়াছিল, সে কথা স্মরণ করিলে, হৃদয় পুলকিত হয়। মহারাজ মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সহসা একলম্ফ দিয়া 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া যেই কীর্তন আরম্ভ করিলেন, তৎক্ষণাৎ কীর্তন খুব জমিয়া গেল। সে অপূর্ব দৃশ্য জীবনে কি আর দেখিতে পাইব!

১৯১৬ সালের প্রথমে ঢাকায় শ্রীশ্রীমহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ গিয়াছিলেন। তখন দেখিয়াছি প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর

পর্যন্ত নানা স্থান হইতে ভক্তশ্রেণী আসিয়া কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান, আর সকলেই সেই মহামহোৎসবের অঙ্গ পুষ্ট করিতেছে। বাবুরাম মহারাজ অবিশ্রাম তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলিয়া যাইতেছেন। আহার ও স্বল্পকাল নিদ্রার সময় ব্যতীত, নিরবধি আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছিল। এই যে প্রচারের ব্যাপারে তিনি যাইতেন তাহার সম্বন্ধে তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি—'ওরে প্রচার কে করবে, ঠাকুরকে প্রচার কাহাকেও করতে হবে না; তিনি স্বয়ং প্রচারিত হচ্ছেন। আমি গিয়ে কেবল দেখলুম ঠাকুরের মহিমা, তিনি নিজে কিভাবে তাঁর ভাব ছড়াচ্ছেন তাই দেখবার জন্য তিনি কৃপা করে আমায় নিয়ে গিছিলেন।' একবার এক উৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহাকে ঘোড়ার গাড়ি করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে, পথিমধ্যে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইবার জন্য ভক্তেরা ঘোড়া খুলিয়া নিজেরা গাড়ি টানিতে লাগিল। তিনি আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন যে, তখন তাঁহার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল; কিন্তু একটু পরেই তাঁহার শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা স্মরণ হইল এবং মনে পড়িল—এইরূপ একটি শকটে তিনি ঠাকুরের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া যাইতেছিলেন। অমনি তাঁহার মন হইতে লজ্জা বিদূরিত হইল। তিনি ভাবিলেন, 'ঠাকুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছে, ঠাকুরকেই বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, তিনি তাহার সেবক হইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতেছেন।' তাঁহার পূর্ববঙ্গে বহুবার যাতায়াত হইয়াছিল। তিনি শেষবার যখন পূর্ববঙ্গে টাঙ্গাইল, ঘারিন্দা প্রভৃতি স্থানে যান তখন মঠ হইতে বিদায় লইয়া যখন নৌকায় উঠিলেন, আমরা সে সময় গঙ্গার পোস্তার উপর দাঁড়াইয়াছিলাম। তিনি মঠের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সে এক অপূর্ব শোভা। মনে হইতেছিল কবিরা যে, মুখের সঙ্গে কমলের তুলনা করে তাহা কল্পনা নহে। শ্রীভগবান নিজ প্রেম অনুভবের জন্য ভক্তের মুখশ্রী এমনি মাধুর্যভরা করিয়া বোধহয় সৃষ্টি করেন। ভক্তের মুখদর্পণে নিজ মুখের

প্রতিবিম্বের শোভা নিরীক্ষণই বুঝি তাঁহার অভিলষিত। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে তিনি যেদিন ওদেশ হইতে ফিরিয়া আসিলেন, সেদিন দেখিলাম তাঁহার মুখে সে শোভা নাই। স্বর্ণবর্ণে কালিমা পড়িয়াছে। তিনি যেন অবসন্ন। প্রাণে আঘাত লাগিল। শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীমুখে একবার শুনিয়াছিলাম যে, ঢাকায় অবস্থান কালে প্রানেশবাবু বাবুরাম মহারাজকে তাঁহাদের গ্রাম দেশে লইয়া যইতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'দেখ হে, ওদের অমন করে যেখানে সেখানে টানাটানি করে নিয়ে যেতে নেই।' মহারাজের সেই সতর্ক বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল। প্রস্ফুটিত কমল ম্লান হইয়া ফিরিয়া আসিল। সে যাত্রায় তিনি ওদেশের গ্রাম্য লোকের জড়তা ভঙ্গ করিবার জন্য, তাহাদিগকে Village reconstruction (পল্লীগঠন) প্রভৃতি কার্যে practical (দক্ষ) করিবার জন্য নিজে পুষ্করিণীতে নামিয়া কচুরীপানা তুলিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর অতি পবিত্র উপাদানে গঠিত ছিল। এত পবিত্র যে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, 'ওর হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ'—এত শুদ্ধ শরীর লইয়া তিনি সেইবার এক……আহ্বানে তাহার হাত হইতে খাইয়াছিলেন, তাহাতেই বোধ হয় তাঁহার শরীর এত খারাপ হইয়াছিল। পূজনীয় মহারাজও সেইরূপ বলিয়াছিলেন—'ওরা পবিত্র বংশজ, ওদের ধাতে কি ঐসব অনাচার সহ্য হয়!'

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত যে তাঁহার ঐকান্তিক প্রেমের সম্বন্ধ ছিল, তাহা পূজনীয় মহাপুরুষজীর মুখে শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন—'ঠাকুর বলিতেন, শ্রীমতীর অংশে তাঁর জন্ম।' বৃন্দাবন লীলাসহচরী পরম ভাগ্যবতী মাধুর্য-ঘন-মূর্তি ব্রজেশ্বরী রাধারানী যিনি স্বয়ং শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তি, যাঁকে অবলম্বন করে রসময় রাসেশ্বর শ্রীমন্মদনগোপাল স্বীয় মাধুর্য রস অনুভব করিবার জন্য আপনি দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছিলেন—সেই শ্রীমতীর অংশে আবির্ভূত শ্রীভগবানের প্রেমাস্পদ শ্রীমৎ আচার্য প্রেমানন্দজীর জীবনের মধুময়

স্মৃতি তাঁহার শুভ জন্মতিথি দিনে আলোচনা করিয়া প্রেমিক রসিক ভক্তবৃন্দ, আপনারা সেই মাধুর্য রস উপভোগ করুন। *

ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু

---

* উদ্বোধনের সৌজন্যে ১৩৩৯ অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

পরিশিষ্ট

স্বামী কমলেশ্বরানন্দের মহাসমাধির সংবাদ

"গত ৭ই কার্ত্তিক (১৩৪৩) রাত্রি ১২টা ৫৬ মিনিটের সময় বেলুড় মঠের অন্যতম সন্ন্যাসী স্বামী কমলেশ্বরানন্দজী উনিশ দিন জ্বরে ভুগিয়া ৪৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল ললিতচন্দ্র বসু। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং বেলুড় মঠের পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ প্রাচীন সন্ন্যাসীদিগের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা এবং শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গত চতুর্দশ বৎসর যাবৎ তিনি বেলুড় মঠের অন্তর্গত ভবানীপুর গদাধর আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। বাংলাদেশে বেদাধ্যয়নের প্রচলন করা তাঁহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং তজ্জন্য ভবানীপুর গদাধর আশ্রমে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বেদ এবং বেদান্ত, উপনিষৎ, ন্যায়, ব্যকরণ, প্রভৃতি শাস্ত্রাধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এই বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য তাঁহাকে আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে দেখিয়াছি। বৈদিক যজ্ঞাদি-ক্রিয়া-কাণ্ডের উপর তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের লইয়া তিনি অনেকবার 'রুদ্র-যজ্ঞ' সম্পাদন করিয়াছেন। বেদান্ত, উপনিষৎ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল এবং উপনিষৎ ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং ব্যাখ্যায় তিনি শ্রোতাবৃন্দকে মুগ্ধ করিতেন। গত দুই বৎসর যাবৎ উদ্বোধন কার্যালয়ে তিনি প্রতি রবিবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং অতি প্রাঞ্জলভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়া অনেক ধর্মপিপাসু ভক্তের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন। স্বামী কমলেশ্বরানন্দজী সায়ণাচার্য

ভাষ্যসহিত স্বাধ্যায়-প্রশংসা, নাসদীয়-সূক্ত, হিরণ্যগর্ভ-সূক্ত প্রভৃতি বেদাংশ সঙ্কলন এবং বাংলা ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়া 'শ্রুতিসংগ্রহঃ' নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

সর্বোপরি ভগবৎপ্রেমই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল। তিনি তাঁহার অমায়িক ব্যবহার এবং স্নেহ-ভালবাসায় সকলের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। আজ আমরা আন্তরিকভাবে তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছি।"*

---

* উদ্বোধনের সৌজন্যে ১৩৪৩ অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত।